জলকন্যার মন

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবভারতী
৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিঃ-১২

প্রথম প্রকাশ
জুলাই—১৯৫৮

প্রকাশক
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রণ
সন্তোষ কুমার ধর
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম—তিন টাকা

শ্রীরমাপদ চৌধুরী

বন্ধুবরেষু—

জলকন্যার মন

এই লেখকের

শ্বেত কপোত

সিন্ধুর টিপ

দেবকন্যা

সীমাস্বর্গ

জনপদবধূ (যন্ত্রস্থ)

ময়ূরপঙ্ক্ষী ভাসিয়ে দিয়ে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন রাজপুত্র আর সওদাগরপুত্র। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় তরী গেল ডুবে, কে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে—রাজপুত্র অজ্ঞান-অবস্থায় ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছলেন জলকন্যার দেশে,—জলকন্যাদের রাজকুমারী একভাবে বসে রইলেন রাজপুত্রের শিয়রে,—প্রহরের পর প্রহর যায়,—চেয়ে রইলেন তিনি রাজপুত্রের মুখের দিকে,—দেখে দেখে চোখ আর ফেরে না,—বিহ্বলকণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন,—জাগো কুমার, জাগো, এবার চোখ মেলো।

বেশ মনে আছে, আমি আর মেনন মোটরলঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম পেট্রোল-ডিউটিতে। সমুদ্র তখন খুবই শান্ত, পাহাড়ের ওপর লুকানো যে অবজারভেশন-পোস্টটি ছিল, সেখান থেকে দেখছিলাম, যেন শিশুদের হাতের-লেখা-অভ্যাস-করা শ্লেটের মতোই পড়ে আছে সমুদ্র।

মেনন বললে,—চল মল্লিক, ঐ যে ব্যাক-ওয়াটারের কাঠের জেটিতে মোটরলঞ্চটা বাঁধা রয়েছে, ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

—সে কী!

—হ্যাঁ, খাবার নেই, দাবার নেই, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এভাবে পাহাড়ের মধ্যে বসে বসে পচে লাভ নেই! তাছাড়া, চারিদিক ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা, দেশটা তো প্রায় নিয়েই নিলো, এখন প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যও বেরিয়ে পড়া দরকার, বুঝলে?

বলেছিলাম, কিন্তু সমুদ্রেও তো…

—লেট্‌স্‌ টেক্‌ এ চান্স! এ ছাড়া উপায়ই বা কী!

—বেশ।

কোন্ সময়ের কথা বলছি জানো? হিরোসিমা-নাগাসাকিতে য়্যাটম বোম পড়েছিল কোন্ সালে? ঐ দেখ, সালটাল সব ভুলে বসে আছি! বোমা-পড়ার ঠিক আগের কয়েকটা দিনের ঘটনা।

তা পুরো একটা দিন কেটে গেল মোটরলঞ্চে। অর্থাৎ বিকেলের দিকে রওনা হয়েছিলাম, সমস্ত রাতটা কেটে গিয়ে তখন রীতিমত সকাল হয়ে গেছে।

দিগন্তরেখায় থরে থরে সাজানো শুভ্র মেঘপুঞ্জ—আর, তারই মধ্য থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে উষাকালের বিচ্ছুরিত বিভা! ছোট ছোট তরঙ্গ-ভঙ্গিমার শিরে শিরে সেই আরক্তিম আলোকরেখা এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাঙ্গলিকের মতো! দেখে দেখে ফিরতে চায় না চোখ! কোথায় রইল যুদ্ধ, আর কোথায় রইল সৈনিক-জীবন, সব ভুলে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলাম পূর্ব দিগন্তের দিকে! লঞ্চের মুখ কিন্তু আমার ঠিক পিছনে,—আমাকে নিয়ে যেন প্রাণপণে পিছিয়ে যাচ্ছে লঞ্চ—আর ভাঙা ঢেউগুলো শুভ্র তুধরাজ সাপের দলের মতো কিলবিল ক'রে ছুটে আসছে পিছনে পিছনে!

মেনন ছিল নিজেই হুইল ধ'রে। কাছে গিয়ে বললাম,—যাচ্ছি কোন্ দিকে?

—ভগবান জানেন! কম্পাস তো নেই, বোঝবারও উপায় নেই!

কোন্ সমুদ্রে আমরা লঞ্চ ভাসিয়েছিলাম জানো? দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার টেবিলটার ওপরে একটা বড় ম্যাপের বই আছে, সেটা নিয়ে এসো তো? এনেছ? বার করো ভারতের ম্যাপ। করেছ? এই যে, কলকাতা থেকে বরাবর রেঙ্গুন পর্যন্ত যাও। রেঙ্গুন থেকে এবার নিচে নামো। এই যে সবার ডাইনে তীরভূমির রেখার সংলগ্ন কতগুলি বিন্দু দেখতে পাচ্ছ—এগুলিকে বলে মারগুই আইল্যাণ্ডস্! এইসব আইল্যাণ্ডের খবর বিশেষ কিছু জানা যায় না, শোনা যায়, এই সব নির্জন দ্বীপের আশেপাশে এক

ধরনের 'আদিবাসী' বাস করে, যারা নৌকোর ওপরে থাকে, নৌকোই তাদের ঘরবাড়ি, নৌকোই তাদের সংসার,—তারা সম্পূর্ণ নিরাবরণ, সমুদ্রে মাছ ধরাই তাদের জীবিকা।

এবার, আবার ম্যাপের দিকে তাকাও। বার করো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামানের মাঝামাঝি জায়গায় আঙুল রেখে ডানদিকে সোজা একটা রেখা টানো, দেখবে, মারগুই দ্বীপ আর আন্দামান একটা সমান্তরাল রেখার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি মারগুই দ্বীপ থেকে সোজা আমরা চলতে পারি ক্রমাগত সমান স্পীডে পুরো ছুটো দিন, তাহলে আমরা আন্দামান পৌঁছতে পারব। মেননও আমাকে সেদিন এমনি ক'রে ম্যাপ দেখিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

আমরা সোজাই যাচ্ছিলাম আন্দাজ ক'রে ক'রে। না-ঘুমিয়ে শরীর অবসন্ন, মাত্র আর্মি-বিস্কুট খেয়ে পেট ভরাতে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, দিনের আলো ফুটে উঠেছে, এইবার কিছু উড়ুক্কু মাছ ধরবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? শান্ত সমুদ্রে হঠাৎই এক-একসময় জল থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠছিল মাছগুলো ঝাঁক বেঁধে,—কিছুক্ষণ ছোট পাখীর মতো উড়তে উড়তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল জলে।

এই উড়ুক্কু মাছের সন্ধানেই বোধহয় আবার এসেছিলাম বোটের পিছনদিকে—এমন সময় হঠাৎ মেনন উঠল চেঁচিয়ে,—মল্লিক, শিগগির এদিকে এসো।

ছুটে কাছে যেতেই বললে,—দূরবীনটা নিয়ে দেখ তো—ওরা কারা? একটা বোট মনে হচ্ছে যেন সামনে।

দূরবীনে চোখ লাগিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। একটা কাঠের নৌকো, তাতে জন-ছুই লোক ব'সে।

মেনন হুইলটা আমার হাতে দিয়ে এইবার নিজে দেখতে লাগল ভালো ক'রে। বললে,—কাঠের নৌকোই বটে, কিন্তু ধরনটা অদ্ভুত। আবার রঙ দিয়ে চিত্র-বিচিত্র করা। ছোট্ট ছই আছে,

মাস্তুল আছে, দেখেছ? একটা লোক দাঁড় বাইছে, আরেকজন চুপ ক'রে বসে আছে তার সামনে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ চোখে দূরবীন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেনন, তার পরে হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল উল্লসিত কণ্ঠে,—ইউরেকা!

—কী ব্যাপার!

বললে, স্পীড বাড়িয়ে দাও তো মল্লিক, ছুটে গিয়ে ওদের ধরতে হবে। ওরাও দেখতে পেয়েছে আমাদের, দাঁড় বাইছে প্রাণপণ!

ব'লে তাড়াতাড়ি হুইলে ছুটে এসে নিজেই বাড়িয়ে দিল স্পীড, মুহূর্তে বোটের মুখটা শূন্যে একটু উঁচু হয়ে হিংস্র হাঙরের মতো শান্ত জলে প্রবল ঢেউ তুলে ছুটে চলল নৌকোটার দিকে।

বলা বাহুল্য, মেননের এই বেপরোয়া ভাব আমার একটুও ভালো লাগছিল না। প্রথমত, সমুদ্রে এভাবে বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ার অর্থই হচ্ছে অজস্র বিপদের সম্মুখীন হওয়া। ঝড় উঠতে পারত, বোটের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যেতে পারত, আর সব থেকে বড়ো কথা,—যে কোনদিক থেকে আসতে পারত 'জাপু' অর্থাৎ জাপানীর দল। জাপানীদের নৌ-জাহাজ ছিল, ডুবোজাহাজ ছিল, এবং সর্বোপরি যা ছিল, তা হচ্ছে টহলদারী এরোপ্লেন। ওপরের আকাশ থেকে একবার দেখতে পেলেই হ'ল—অমনি চিলের মতো ছোঁ মেরে নিচে নেমে আসবে, আর মেশিনগানের গর্জন চলবে—কট্-কট্-কট্-কট্-কট্! কোথায় হারিয়ে যাবে বোট, কোথায় হারিয়ে যাবে মেনন, কোথায় আমি। একটা ঘূর্ণি তুলে গুলিতে-ঝাঁজরা হওয়া বোটটা ডুবে যাবে, আর, আমাদের বুকের রক্তে লাল হওয়া জলতরঙ্গকে ঘিরে কিছুক্ষণ ধরে নেচে-নেচে ফিরবে ফেনায়িত সমুদ্রের ঢেউ, তার পর আবার হয়ে যাবে সব শান্ত,—স্বাভাবিক নিরীহ স্তিমিত ঢেউ নিয়ে যেমন কল্লোল তুলে ছন্দে-ছন্দে গান গেয়ে চলে ভারত মহাসাগর, তেমনিই গান চলবে অনুক্ষণ,—শুধু পৃথিবী থেকে সেই

মুহূর্তে মুছে যাবে দুটি নাম—কে-পি-কে মেনন আর অনুকূল মল্লিক।

সেই মুহূর্তে আমাদের যা দরকার ছিল তা হচ্ছে, একটু নিরাপদ আশ্রয়, একটু ঘুম, আর কিছু খাবার। যারা যাচ্ছিল চিত্র-বিচিত্র করা কাঠের নৌকো বেয়ে, তারা শত্রু নয় এবং কোন সৈন্যবাহিনীর কেউ নয়, এটুকু জানাই ছিল সেদিন আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কে থামাবে সেদিন মেননকে ?

আমাদের ঢেউয়ে ওদের নৌকো ভয়ানক দুলে দুলে অবশেষে কাত হতে-হতে বেঁচে গেল। দূর থেকে যতটা ছোট ভেবেছিলাম, নৌকোটা প্রকৃতপক্ষে তত ছোট নয়, আকারে আমাদের বোটের অন্তত দ্বিগুণ। কিন্তু, আমাদের বোটের সঙ্গে ওদের নৌকোটা ক্ষিপ্র হাতে মোটা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে আমি আর মেনন যখন ওদের নৌকোর ওপর গিয়ে লাফ দিয়ে পড়লাম,—তখন, যা দেখেছিলাম, তা অন্তত এই অনুকূল মল্লিকের জীবনে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখবার মতোই অত্যাশ্চর্য ঘটনা !

নৌকোর ঠিক ছইয়ের কাছেই দুটি প্রাণী। না, দুটি প্রাণী নয়,— দুটি প্রাণী আর একটি শিশু। একটি পুরুষ, একটি নারী আর একটি শিশু। তার থেকেও বলা ভালো, একটি তরুণ, একটি তরুণী আর একটি বছর তিনেকের শিশু। তিনজনই সম্পূর্ণ নিরাবরণ, কোমরে এক টুকরো কাপড়ও কারুর ছিল না।

আমরা ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগোতে লাগলাম। সেদিন ভীত, ত্রস্ত দুটি নরনারীকে দেখে আমাদের মধ্যে ও-ভাব কেন জেগেছিল, তা মনস্তাত্ত্বিকেরাই বলতে পারবেন, হয়তো তুমিও বলতে পারবে। আমরা বন্ধুর মতো গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম ওদের সামনে, বলতে পারতাম আকার-ইঙ্গিতে,—আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদের কিছু খেতে দাও !

তা নয়, আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম শত্রুর সামনে শত্রুর মতো।

ফ্রন্টলাইনে হ্যাণ্ড-গ্রানেড-ছোঁড়াছুড়ি-পালার পর, বারুদের ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই যেন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেছে শত্রুপক্ষের কোন সৈনিকের সঙ্গে—এমনি ভঙ্গিমায় আমরা এগিয়ে গেলাম সামনে।

সিগন্যাল-পাহাড়ে শত্রু-তাড়িত হয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। সহকর্মীদের কাছ থেকে ছিটকে সরে এসেছি, —কঠিন সিমেণ্ট-জমানো ছোট্ট একটা নিচু ঘর—লুকানো 'ও-পি' অর্থাৎ যাকে বলে অবজারভেশন পোস্ট—লতাগুল্ম দিয়ে ঢাকা, ঘন গাছপালার আড়াল দেওয়া,—তারই মধ্যে কীভাবে কাটতে পারে দিন! 'এমার্জেন্সী র‍্যাশন' অর্থাৎ বিস্কুট খেয়ে খেয়ে কদিন চলতে পারে মানুষের! প্রত্যেকটি দিন—প্রত্যেকটি মুহূর্ত—ভয়ে কেঁপেছি—হাতে অস্ত্র নেই—যে কোন মুহূর্তে জাপানীরা এসে বন্দী করতে পারে—অথবা নিজেদের সৈন্যবাহিনীর লোকেরাও আসতে পারে, মিলিটারী আইনে আমাদের দুজনকে 'পলাতক' সাব্যস্ত করে 'কোর্ট মার্শাল'ও করতে পারে! সে যে কী মানসিক অবস্থায় প্রহর কাটানো, তা ব'লে বোঝাতে পারব না!

মেনন কোচিন অঞ্চলের সমুদ্রতীরের লোক, বললে,—এসো মল্লিক, এভাবে পচে মরার থেকে পেট্রোল-ডিউটিতে বেরিয়ে পড়ি সমুদ্রে। কেমন?

বলেছিলাম,—আমরা আর্মির লোক, নেভীর তো নয়, সমুদ্রে যাব কেন পেট্রোল-ডিউটিতে? আর যাবই বা কার হুকুমে!

মুহূর্তে অফিসারের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ডের স্বরে বললে,—আই কম্যাণ্ড মাইসেলফ! নিজেকেই নিজে হুকুম করছি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে!

বলেছিলাম, তার থেকে মরিয়া হয়ে জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়?

—পাগল!—মেনন বলেছিল,—ছারপোকার মতো পিষে মারবে!

হাতে বন্দুক নেই, আছে শুধু ত্বজনের কাছে ত্বটো ফাঁকা গুলিশূন্য পিস্তল। না, না, তা হয় না, যা থাকে কপালে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিই এসো।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মেনন কী পাগল হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত! সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে কী! সাঁতার কেটে বিপুল সমুদ্রে যাব কতদূর!

পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় দিয়ে বলেছিল,—মোটর চালাতে যখন আমি ওস্তাদ, মোটর-বোট চালাতেও পারব। একেবারে যে অভিজ্ঞতা নেই তা-ও বলা যায় না, সখের খাতিরে স্টুডেন্টস্ লাইফে বোট নিয়ে যথেষ্ট চালিয়েছি সমুদ্রে।

—কিন্তু বোট তুমি পাচ্ছ কোথায় ছাই!

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধ'রে টেনে ঘরের একটা কোণে ঘুলঘুলির কাছে নিয়ে গেল মেনন। বললে,—একেবারে তীর ঘেঁষে ব্যাক-ওয়াটারের কাঠের জেটিতে বাঁধা ঐ 'এম-এল্'টাকে দেখতে পাচ্ছ? বলেছিলাম না, এটা একটা ন্যাভাল আউটপোস্ট? ন্যাভাল ডেস-প্যাচইউনিটটি হয় রিট্রিট করেছে, নয় মারা গেছে! কালই আমার চোখে পড়েছিল 'এম-এল্'টা, তবে প্রথমেই ভেবে ঠিক করতে পারি নি, এভাবে অথৈ জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব কিনা! নাও, মল্লিক, চল, আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না!

জঙ্গী-দলে থাকতে থাকতে বিশেষ ক'রে ওয়ার-ফ্রন্টে এসে পরিবেশের গুণ মনকেও আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তত্নপরি, দিন-কয়েকের এই নিদারুণ বন্দী-অবস্থা,—সমস্ত মিলে আমাদের ভিতরে যে অবরুদ্ধ এক আক্রোশ বাষ্পের মতো জমে উঠছিল, তা-ই যেন অসহায় প্রাণীদের ওপর এসে ভেঙে পড়ল প্রবল ঝঞ্ঝার মতো।

শিশুটি ছিল মায়ের আড়ালে। তাকে ভালো চোখে পড়ছিল না, কিন্তু মেয়েটি আর পুরুষটি যেন কাঁপছিল বেতস-পাতার মতো।

হিংস্র ভঙ্গিমায় আমরা এগিয়ে আসছি, একেবারে তাদের পায়ের কাছে এসে পড়েছি, হঠাৎ পুরুষটি, সম্ভবত আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণাতেই, অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেননের ওপরে, হাতে তার হারপুনের মতো কী একটা অস্ত্রও ছিল।

কিন্তু, বিরাট দশাসই চেহারা মেননের, লম্বাতেও প্রায় ছ'ফুট—তার সঙ্গে পাঁচ ফুটের বেশী লম্বা নয় যে লোকটি, সে পারবে কতক্ষণ! আমার সাহায্যেরও দরকার হ'ল না। লোকটাকে মুহূর্তে কাবু ক'রে, তার হারপুনটি কেড়ে নিয়ে, সেই হারপুনেরই লম্বা দড়ি দিয়ে লোকটার হাত-পা বেশ ক'রে বেঁধে ফেললে মেনন।

আমি কিন্তু অবাক হয়ে ততক্ষণ দেখছিলাম নিরাবরণ লোকটির অদ্ভুত স্বাস্থ্যসমৃদ্ধি! শক্ত দড়ির বাঁধনের মধ্য দিয়ে ফুলে ফুলে উঠছিল তার সুগঠিত মাংসপেশীগুলি। তার কাঁধ, তার বুক, তার উরুদেশ, তার বাহু—সুদৃঢ় পেশীর আত্মঘোষণায় প্রচণ্ড অধীর হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছিল, মোটা দড়ির বাঁধন এই মুহূর্তে পট্‌পট্‌ ক'রে যাবে ছিঁড়ে, আর লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে আমাদের ওপরে।

নৌকোর দুদিকে দুই উঁচু অংশের মাঝখানে খোলের একেবারে গহ্বরে যে স্নিগ্ধ ছায়াটুকু পড়ে আছে, তারই মধ্যে লোকটাকে টেনে এনে কাঠের একটা খুঁটির সঙ্গে বেশ ভালো ক'রে বেঁধে ফেলা হ'ল।

ধ্বস্তাধ্বস্তির পর একটু দম নিয়ে ছইয়ের কাছে উঠে এল মেনন। শিশুটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে দুটি ভীত ত্রস্ত চোখ মেলে ছইয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে বসে আছে মেয়েটি।

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে সেইদিকে তাকিয়ে থেকে তার পর আমাকে ইঙ্গিত ক'রে ছইয়ের মধ্যে নিশাচরী বেড়ালের মতো হামা দিয়ে কিছুটা ভিতরে ঢুকে গেল মেনন।

পুরুষটি ততক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করছে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলার জন্য। অদ্ভুত একটা চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছিল তার কণ্ঠ

থেকে। আমি নিচু ছইটার কাছে হাঁটু মুড়ে ব'সে ছইয়ের ভিতরটা আর বাইরের ঐ লোকটার দিকে চোখ রেখেছি। মেনন যত এগিয়ে যাচ্ছে ছইয়ের ভিতরে, শিশুটিকে বুকে ক'রে ততই কাঁপছে মেয়েটি ভয়ে। হাঁটুদুটো তার কাঁপছে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে, এত ভয় পেয়েছে যে চোখদুটি বিস্ফারিত, কণ্ঠ দিয়ে স্বরটুকুও বেরুচ্ছে না!

—মল্লিক?

—কী?

মেনন বললে,—ছইয়ের মধ্যে কোথাও কোন খাবার নেই। কোথায় রেখেছে কে জানে! ঐ মেয়েটিকে কাবু না করলে কোন উপায়ই নেই খাবার সংগ্রহ করার!

—চুলোয় যাক খাবার!—বলে উঠলাম, তুমি বেরিয়ে এসো দেখি মেনন? দেখছ না কী ভীষণ ভয় পেয়েছে মেয়েটা! এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়বে!

আমার কথা শোনবার পাত্র মেনন মোটেই নয়, দ্বিতীয়তঃ প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় আমাদেরও দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। মেনন আরও এগিয়ে যেতে লাগল মেয়েটির দিকে।

অকস্মাৎ একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ,—তার পরেই মায়ের কোলে ঢলে পড়ল শিশুটি।

—কী হ'ল!

সভয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল মেনন। পুরুষটির দিকে তাকিয়ে দেখি, সে আবার মরিয়া হয়ে দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। দড়িটা যেন তার দেহের কাঁধ, বাহু আর উরুতে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে! 'ওয়াক ওয়াক' ধরনের কী একটা শব্দ ক'রে কী যেন চেঁচিয়ে বললে পুরুষটি, আর এদিকে মেয়েটি তার ঢলে-পড়া শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

মেনন বললে,—ওর বেবিটা কী মারা গেল? তুমি শিগ্‌গির ওর কাছে যাও দেখি?

—সে কী! আমি যাব কী!

মেনন আমাকে ধ'রে চট ক'রে ছইয়ের মধ্যে ঠেলে দিলে। বললে,—আমার মতো ফর্সা তো তোমার গায়ের রঙ নয়, তোমাকে হয়তো অতটা ভয়ের চোখে দেখবে না! কিন্তু সাবধান, মেয়ে ব'লে নিশ্চিন্ত বোধ ক'রো না। এরা 'ক্যানিবল্‌স্' অর্থাৎ 'মানুষ-খেকো' মানুষ কিনা, কে জানে!

—অঁ্যা! ক্যানিবল্‌স্!

তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্য থেকে সরে এলাম বাইরে। মেয়েটিই তখন শিশুটিকে কোলে ক'রে তার হাতে-পায়ে-বুকে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নানান্ ভাবে দেখছে!

মেনন বললে,—ওরা মানুষখেকো হোক আর যাই হোক, ওদের নৌকোয় এসে ওদের প্রথমেই ভয় পাইয়ে দিয়েছি। নিয়মও তো হচ্ছে এই-ই। প্রথমেই ভীতির সঞ্চার করিয়ে দিতে হয়। মনোবলটা ভেঙে দিতে হয়। কী করব,—এই-ই তো মিলিটারীর শিক্ষা। তবে হ্যাঁ, বুকের পাটা আছে বটে পুরুষটির! রুখে দাঁড়িয়ে রীতিমত লড়াই ক'রে তবে কাবু হয়েছে। না না, 'কাবু' হয়েছেই বা কোথায়? আমার বেটনটা নিয়ে এসো তো লঞ্চ থেকে, কয়েক ঘা বেশ কতক দিই, হাড়গোড় দু'একখানা ভাঙুক, বাছাধনের হুটোপাটি করা বেরিয়ে যাবে!

—কী বলছ, মেনন!

মেনন ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা নির্মম যন্ত্রের মতো বলতে লাগল, ঠিকই বলছি মল্লিক। প্রহার না করলে চরম ভয় ওদের মধ্যে জাগানো যাবে না। যদি 'ক্যানিবল্'ও হয়, কিছুই করতে সাহস পাবে না আর!

ব'লে উঠলাম,—কিন্তু কী দোষ করেছে ওরা মেনন? এসো,

এদের ছেড়ে দিয়ে লঞ্চ নিয়ে আমাদের পথে আমরা বেরিয়ে পড়ি!

ধক্ ক'রে ছুটি চক্ষু যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠল মেননের, বললে, কোথায় আমাদের পথ? হাতে কম্পাস নেই, উধাও সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কোথায় যাচ্ছি, আন্দামান কি আরাকান জানি না! যে কোন মুহূর্তে বিপক্ষের প্লেন এসে ডাইভ-বম্বিং করতে পারে। আর, দেখেছ, লঞ্চটার ফুয়েল-মিটারের কাঁটাটা কী বলছে? ফুরিয়ে এসেছে, পেট্রোল ফুরিয়ে এসেছে একেবারে!

—অ্যাঁ! বলো কী!

—মরিয়া হয়ে গেছি ভাই!—মেনন বললে,—এখন এদের পেয়ে গেছি বলে হয়তো রক্ষা পাব। এরাই হবে আমাদের কাণ্ডারী। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের! কোনরকমে পোর্ট-ব্লেয়ারে যদি গিয়ে পৌঁছতে পারি!

মেয়েটি ততক্ষণে শিশুটির বিবশ, নিস্পন্দ দেহটিকে ছইয়ের ওপর রেখে পাগলের মতো নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। আর, সেই পুরুষটি তখনও আপ্রাণ চেষ্টা করছে তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে দড়ি ছিঁড়বার। পারছে না, চিতাবাঘের মতো চাপা গর্জন করছে নিষ্ফল আক্রোশে।

দেখা যায় না এ করুণ দৃশ্য চোখ চেয়ে। বললাম,—মেনন, যা হবার হোক, আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে দেখি বাচ্চাটার কী হয়েছে। সত্যিই মরে গেছে কিনা!

—দেখ!—ব'লে ছইয়ের বাইরে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মেনন। আমি নিচু ছইয়ের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম।

লম্বা ঘন কেশরাশির এক প্রান্ত ছুই দাঁতের মধ্যে কামড়ে ধ'রে আমার দিকে তাকালো মেয়েটি তার সমস্ত কান্না আর উত্তেজনা থামিয়ে। আমি একটু হাসলাম তার দিকে চেয়ে, তার পরে ইঙ্গিতে ছেলেটাকে দেখিয়ে বললাম,—কী হয়েছে?

সে তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়ে ছেলেটাকে আড়াল ক'রে ধরল। ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলাম,—আমাকে দাও, আমি দেখি।

উপুড় হয়ে দুটি হাত আর পায়ের ওপর ভর রেখে শিশুটিকে বাঘিনীর মতো আগলে রাখতে চাইল মেয়েটি। আবার ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলাম,—আমার কাছে দাও, আমি ভালো ক'রে দিচ্ছি।

মেয়েটি সন্দিগ্ধ, প্রখর চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি আরও দু পা তার দিকে এগুতে-না-এগুতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল ইতিমধ্যে। জলের ধার থেকে জলের মধ্যে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিজ্ঞ সাঁতারুরা,—ঠিক তেমনি ক'রে বাইরে থেকে কে যেন হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির ওপরে। মেয়েটি কিছু করার আগেই তার কোমরটা ধ'রে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল খানিকটা দূরে!

চেয়ে দেখি, মেনন! বললে,—আমি ধ'রে আছি মেয়েটাকে। তুমি বাচ্চাটাকে দেখ!

ততক্ষণে হাত-পা ছুঁড়ে, চিৎকার ক'রে একটা কাণ্ডই বাঁধিয়েছে মেয়েটি। আমি চট্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলাম। দেখলাম নাড়ী, দেখলাম নাকের কাছে হাত নিয়ে। না, অন্য কিছু নয়, অজ্ঞান হয়ে গেছে মাত্র ছেলেটা। সম্ভবতঃ ভয়ে। চোখে-মুখে একটু জলের ছিটে দিলেই জেগে উঠবে। কিন্তু, ওর মা কি ভালো বুঝতে পারে নি সন্তানের অবস্থা? হয়তো ঘটনার আকস্মিকতা আর অভাবিত পারিপার্শ্বিকই ভীতিবিহ্বল ক'রে তুলেছিল মেয়েটিকে।

বললাম,—তুমি ওকে ছেড়ে দাও মেনন। ছেলেটা মরে নি।

—মরে নি—মেনন বললে, বাঁচা গেল। কিন্তু ছেড়ে দিলে তোমায় যদি গিয়ে আক্রমণ করে?

এমন ক'রে ওকে সুকৌশলে ধরেছে মেনন যে মেয়েটা আর তেমন ক'রে ছটফট করতে পারছে না, কিন্তু লক্ষ্য করছিলাম, ওর হাত কামড়ে দেবার চেষ্টা করছে। বললাম,—ছেড়ে দাও ওকে, মেনন। ও আর আমাকে আক্রমণ করবে না।

কী ভেবে পরমহূর্তেই বাহুবন্ধন শিখিল ক'রে দিল মেনন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তীরের মতো আমার কাছে ছুটে এল মেয়েটি। ইঙ্গিতে বললাম,—ভয় নেই, এক্ষুনি ভালো হয়ে যাবে।

আশ্চর্য, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করল মেয়েটি, আমাকে সত্যিই আক্রমণ করল না, বা কোল থেকে কেড়েও নিলো না ছেলেটাকে। ইঙ্গিতে আবার বললাম,—একটু জল আনতে পারো?

প্রথমটা ঠিক বোঝে নি, আমি বারকয়েক আমার মুখের কাছে হাত নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতেই সে বোধ হয় ধরতে পারল ইঙ্গিতটা। পরমুহূর্তেই ছইয়ের একপাশে সরে গিয়ে কাঠের পাটাতন সরিয়ে ফেলল, তার পর উবু হয়ে ব'সে, নিচে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল মোটা বাঁশের একটা চোঙা।

বোধ হয় বাঁশের চোঙাতেই ওরা জল ভর্তি ক'রে রাখে। চোঙাটা নিয়ে আমার কাছে আসতেই ওটা ওর হাত থেকে নিয়ে ছেলেটার মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম জল। বারকয়েক এরকম করতেই ঠোঁটদুটো একটু নাড়ল ছেলেটি। ফোঁটা ফোঁটা আরও জল ঢেলে দিতে লাগলাম ওর মুখে, ধীরে ধীরে একসময় চোখ খুলল ছেলেটি।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম, তার পর ছেলেটিকে তুলে দিলাম ওর কোলে।

ছেলেটিকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বুকে চেপে ধরল ওকে, আরামে আর আবেশে চোখ বুজল! সে যে কী অপূর্ব মূর্তি দেখেছিলাম, তা আজও ভুলতে পারি নি! মেননের সঙ্গে ছুটোপাটি করতে গিয়ে

গলার কাছাকাছি থেকে বক্ষদেশের কিছুটা পর্যন্ত টক্‌টকে লাল হয়ে আছে, সেইখানে শিশুটির মুখখানা ধরেছে চেপে। অগাধ, অবাধ কেশকলাপ কাঁধে, পিঠে, বুকের পাশে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে পড়েছে! বসে আছে হাঁটু দুটো মুড়ে! আর, মাতৃস্নেহের উজ্জ্বল আভায় সমস্ত মুখখানি ভরা, বার বার গালদুটি ছোঁয়াতে লাগল শিশুর মাথায়। তার পরে একটু চেঁচিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন ব'লে গেল খানিকটা।

বাইরে থেকে বন্দী পুরুষটির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, অবশ্য বোঝা গেল না ভাষা। তবে কথার মধ্যে, 'অঃ-অঃ!' মতো শব্দ শোনা গেল বারকয়েক।

মেনন কিন্তু এর মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে ছিল না। যেখান থেকে পাটাতন সরিয়ে মেয়েটি বাঁশের চোঙা-ভর্তি জল বার ক'রে এনেছিল, চুপিচুপি এগিয়ে এসে ঠিক সেইখানটায় ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কী-কী যেন বার ক'রে নিয়েছে। চেঁচিয়ে বললে,—মল্লিক, চলে এসো। পেয়েছি।

—কী?

—খাবার।

ব'লেই ছোট একটা বাঁশের ঝুড়ি উঁচু ক'রে দেখালো। বললে, আরও কয়েক ঝুড়ি আছে। আর আছে জল-ভর্তি অজস্র বাঁশের চোঙা!

—ঝুড়িতে আছে কী তোমার ছাই?

—মাছ।

—মাছ?

—হ্যাঁ, তবে শুকনো ক'রে রাখা।

বললাম,—তাতে কী তোমার সুবিধা হবে?

বললে,—আর্মিতে ঢোকার পর থেকে সবই সুবিধা হয়ে গেছে! আমিষ-নিরামিষ সবই এখন সমান।

মেয়েটি কিন্তু কিছু বলল না। আমার দিকে চেয়ে রইল শুধু। অদ্ভুত কোমল সে দৃষ্টি!

ভালো ক'রে এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম তাকে। বয়স খুব কম, আঠারো-উনিশের বেশি নয়। দেহের গড়ন যদি সৌন্দর্যের নিরীখ হয়, তো অসাধারণ সুন্দরী এই মেয়ে। দীর্ঘাঙ্গিনী নয়, বরং খাটোই বলতে হবে। কিন্তু কোথাও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হ'ল না। গায়ের রঙ কালো নয়, আমাদের দেশের শ্যামলী মেয়েদের মতোই তার দেহের বর্ণ, তবে একটু হলদে-হলদে ভাব মেশানো। দেহ নয়, যদি কোথাও খুঁত থাকে তো, সে তার নাকটিতে! 'তিলফুলজিনি নাসা' তার নেই, বরং, একটু চাপা, একটু বসা। চোখদুটিও পটলচেরা হরিণচক্ষু নয়, বরং একটু ছোট, একটু গোল-গোল ধরনের। কপালটি ছোট্ট, ভ্রূযুগল খুব সরু, পেন্সিলে-আঁকা দুটি রেখার মতো মনে হয়। আর মাথার অত ঘন, লম্বা, আর রেশমের মতো কেশকলাপ একটা বিস্ময় হলেও, ঠিক মেঘবর্ণ নয়, একটু লালচে, বিশেষ ক'রে অগ্রভাগ! মুখের কিন্তু একটা ভাব আছে, ঠিক বোকা-বোকা ধরনের ফোলা-ফোলা মুখ নয়। আর, ঠোঁট দুটি পাতলা! হ্যাঁ, গোলাপফুলের পাপড়ির সঙ্গে তুলনা দিলে বিশেষ ভুল করা হবে না।

অবাক হয়ে ওকে দেখছি, ওর কিন্তু তাতে সঙ্কোচ নেই, লজ্জা নেই, নিষ্পলক, নিসঙ্কোচ দুটি চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে হাসির কোন রেখা নেই, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আছে কোমলতা।

বাইরে থেকে মেনন হাঁক দিলে,—তুমি যে জমে গেলে মল্লিক। অতটা ভালো নয়, শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আবার হাসলাম একটু। বোঝাতে চাইলাম,—তোমার কোন ভয় নেই, আমরা বন্ধু।

—দূর ছাই, এসো না বেরিয়ে।

—যাচ্ছি।

ওকে পাশ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিচু ছইটার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মেনন বললে,—লঞ্চে চল।

—চল।

লঞ্চে যেতে যেতে চকিতে চেয়ে দেখলাম, পুরুষটি অবশেষে শ্রান্ত হয়ে শক্ত দড়ির বাঁধনের মধ্যে নির্জীবের মতো পড়ে আছে।

লঞ্চে তখন কোন স্পীড ছিল না, নৌকোর সঙ্গে বাঁধা প'ড়ে সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আপন মনে ভেসে চলছিল। মেনন হাতের চুবড়িটা নিয়ে এক কোণে রাখল, বললে,—রাশ-রাশ বাজে কাগজপত্র দেখেছিলাম না লঞ্চটার 'বিল্‌জেসে'র মধ্যে? বার করো সেগুলো। তাতে আগুন ধরিয়ে মাছগুলো পোড়াতে হবে। তাই খাব, বিস্কুট খেয়ে খেয়ে কতদিন বাঁচা যায় বলো?

কাগজের আগুনে মাছ পুড়িয়ে খাওয়ার সে এক বিড়ম্বনা। কিন্তু ত্বরন্ত খিদের মুখে মন্দ লাগল না, বিশেষ ক'রে 'চাঁদা'মাছগুলো। নুনের জল মাখিয়েই বোধহয় ওরা শুক্‌নো ক'রে রাখে, তাই, নুনের অভাব টের পেলাম না আদৌ।

বললাম,—সব পুড়িয়ে দরকার নেই। কিছু থাক, কী বলো?

—বেশ তো!—মেনন আরামে নিজেকে কাঠের বেঞ্চির ওপরে এলিয়ে দিয়ে বলে উঠল,—বাঁশের চুবড়ির এক চুবড়ি মাছ কম স্টোর নয় হে! কিন্তু তাকিয়ে দেখ তো, ওদের ব্যাপারটা কী!

মুখখানা উঠিয়ে ওদের নৌকোর দিকে দৃক্‌পাত করলাম।

—কী হে, সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের?

বলে উঠলাম,—মেনন!

—কী?

—দড়ি পড়ে আছে, লোকটা নেই।

চোখ খুলে আবার চোখ বুজল মেনন, বললে—তা হবে, মেয়েটা এসে লোকটার বাঁধন খুলে দিয়ে গেছে!

একটু শঙ্কিত হয়েই বললাম,—কী হবে!

মেনন বললে,—ক্যানিবল্‌স কিনা কে জানে! শুনেছি মাগুই আইল্যাণ্ডসের আশেপাশে অনেক 'সী-জিপসী' থাকে, যারা এমনি নিরাবরণ, ক্যানিবল্‌স। বাগে পেলে মানুষ শিকার করে, মানুষ মেরে তারপরে পুড়িয়ে খায়।

বললাম,—চল, আবার গিয়ে লোকটাকে ধরি, আবার গিয়ে বেঁধে ফেলি।

—কিন্তু মেয়েটা?

বললাম,—মেয়েটা নিশ্চয়ই আমাদের ধ'রে খাবে না!

—কে বলতে পারে! মেনন বললে,—তবে একথা বলব ভাই মল্লিক, কী অদ্ভুত নরম ঐ মেয়েটির শরীর! ধরেছিলাম তো? মনে হ'ল এক তাল নরম মাখনে গিয়ে যেন আমার হাত পড়েছে!

—তবে?

চোখ খুলল মেনন,—কী তবে?

বললাম,—অত নরম যার দেহ, মনটাও নিশ্চয়ই নরম। কই, আমাকে তো কিছু বললে না।

বাঁকা একটু হেসে মেনন বললে,—শিকারেরও একটা পদ্ধতি আছে ভাই। বনের মধ্যে বাঘ তোমাকে দেখামাত্রই আক্রমণ করবে না। কিছুক্ষণ ছায়ার মতো সে তোমাকে অনুসরণ করবে, লক্ষ্য করবে তোমার গতি-প্রকৃতি, তারপরে সুযোগ বুঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম,—তাহলে তুমি বলতে চাও, সত্যিই এরা ক্যানিবল্‌স?

—আমার তাই দৃঢ় ধারণা! মেনন বললে,—দেখছ না, সভ্য-জগতের একটু আলোও এদের ওপরে এসে পড়ে নি, এবং এত অনগ্রসর এরা, যে কোমরে একটুকরো কাপড় বা গাছের বাকল পর্যন্ত পরে নি! কিন্তু আমাকে সব থেকে অবাক করেছে এরা

নেভিগেশনের দিক থেকে। সাম্পান নৌকোটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ? মাস্তুল অবশ্য আছে, কিন্তু পাল খাটায় নি। পাল না খাটিয়েও সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা কী ক'রে? কেমন ক'রেই বা এরা যায় দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে?

প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে উঠলাম,—আমরা কোথায় আছি বলতে পারো? সমুদ্র আপন স্রোতে কোন্‌দিকে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে?

—ভগবান জানেন! আন্দামানও হতে পারে, আবার রেঙ্গুন কী আকিয়াবও হতে পারে!

বলতে না বলতে হঠাৎ চকিত হয়ে সোজা উঠে বসল মেনন, কেমন যেন উত্তেজিত ওর ভঙ্গি। বললে, মল্লিক,—কান পেতে শোনো তো। প্লেনের শব্দ না?

উল্লাসে উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম,—হাত দিয়ে রুমাল নাড়ব? নিশ্চয়ই প্লেন। যদি দেখতে পায় তো, নেবে আসবে, উদ্ধার করবে আমাদের। ওঃ, আমরা বেঁচে গেছি মেনন, বেঁচে গেছি তা'হলে!

চট ক'রে আমার হাতটা টেনে ধরল মেনন, বললে,—খবরদার! যদি জাপুদের প্লেন হয়? একেবারে ঝাঁজরা ক'রে দেবে তোমার 'কোল্ড-মাটন'টা।

'কোল্ড-মাটন', অর্থাৎ এই দেহপিঞ্জর। মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে গেল আমার সমস্ত উৎসাহ। কিন্তু, তবুও মন থেকে দূর হয় না আশার আলো। বললাম,—এসো না, দেখি একটু মুখ বাড়িয়ে। নিজেদের প্লেনও তো হতে পারে।

—হলেই বা কী! মেনন বললে,—জানো না মিলিটারীর নিয়ম? দল ছেড়ে পালানোর অপরাধে কোর্ট-মার্শাল করবে!

—কিন্তু, আমরা কি পালিয়েছি!

মেনন বললে,—আমরা কী করেছি, তার সত্যতায় ওদের প্রয়োজন নেই,—ওদের রিপোর্ট আর রেকর্ড যা' বলবে, আমাদের

বিচার হবে সেই অনুসারে। আমাদের অফিসার যদি রিপোর্ট দিয়ে থাকে আমরা 'আব্‌স্‌কণ্ডেন্ট',—তবে তাই-ই আমরা,—'দল-পালানো'।

—চুলোয় যাক তোমার মিলিটারী ডিসিপ্লিন্! প্লেনটা যদি···

কিন্তু শব্দ পেলেও দেখা গেল না প্লেনটাকে। মেঘের আড়াল দিয়ে-দিয়ে চ'লে যাচ্ছে বোধ হয়। মেনন কান পেতে শব্দ শুনতে শুনতে বললে,—উঁহু, একটা প্লেন নয়, এক ঝাঁক। 'রেডি ফর অ্যাক্‌শান' বোধ হয়। চ'লে এসো ভিতরে।

এলাম। কিন্তু, ওদের সংবাদ কী? কী অদ্ভুত চুপচাপ পড়ে আছে ওরা দুইয়ের মধ্যে!

মেনন বললে,—অতটা ভয় ক'রো না। ঐ জন্যেই ওষুধ দিয়ে দিয়েছি নৌকোয় পা দিয়েই। ও'দড়ির বাঁধনের ব্যথা অন্তত সাতদিন থাকবে বাছাধনের।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটবার পর বললাম,—মেনন?

—কী?

—নৌকোটা খুলে দাও না ওদের। ওরা যেদিকে খুশি চলে যাক।

—পাগল! মেনন বললে,—আমাদের কী দশা হবে? চলবো কেমন ক'রে?

—তা-ও তো বটে।

আবার চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত। মেনন বললে,—সবসময় নজর রেখো। আমি যা ভয় করছি, তা অন্য জিনিস। তীর-ধনুক বোধ হয় ওদের নেই, থাকলে এতক্ষণে চোখে পড়ত। তবে লুকোনো বর্শা-টর্শা থাকতে পারে। আমাদের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারে! আর শুনেছি, অব্যর্থ এইসব আদিবাসীদের লক্ষ্য!

—কিন্তু, মেনন···?

শেষ করতে পারলাম না কথাটা। বললে,—'কিন্তু'র কিছু নেই, খুব সোজা হিসেব। আমরা সাপের লেজে পা দিয়েছি, ক্রুদ্ধ সর্পরাজ যে কোন মুহূর্তে দংশন করতে পারে!

শিউরে উঠে বললাম,—কিন্তু কেন পা দিতে গেলাম সাপের লেজে?

—উপায় ছিল না ব'লে।

বলে উঠলাম,—দেখ তো, কী মুশকিলটা হ'ল। পিস্তলে একটা গুলিও নেই যে আত্মরক্ষা করব।

ম্লান একটু হাসল মাত্র মেনন। কিছুক্ষণ পরে বললে,—বড় ক্লান্ত লাগছে হে। ইচ্ছা করছে ঘুমিয়ে পড়ি।

কেমন যেন স্বপ্নভরা মনে হ'ল মেননের মন, বললে,—পেটের দায়ে যুদ্ধে নাম লেখালাম। ভাবছি মল্লিক, কার জন্য এ যুদ্ধ?

চুপ ক'রে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বলতে লাগল মেনন,—বাড়িতে আমার তুটি ভাই, তুটি বোন আর মা। ছোট বোনটি বড় ভালোবাসত আমাকে। আমি কোন কারণে রাগ করলে বা ধমকালে অভিমানে গাঢ় হয়ে যেত তুটি চোখের তারা, কখনও বা কেঁদেই ফেলত। আমি গিয়ে তু'হাতে জড়িয়ে ধরতাম, কতো আদর করতাম, তবু অভিমান তার দূর হতো না, কান্না তার থামত না।

একটু থেমে আবার বললে,—জানো মল্লিক, ঐ ক্যানিবল্ মেয়েটাকে ধরেছিলাম তো? কেন যেন আমার সেই ছোট বোনটির কথা মনে হ'ল।

ছ'ফুট লম্বা, দৃঢ়চেতা পুরুষটির চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ঝলমল ক'রে উঠল, বললে,—ঐ ওরই বয়সীই হবে আমার ছোট বোনটা।

অতর্কিত বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ওর মিলিটারী পোষাকের রুক্ষতার মধ্য দিয়ে যে মানুষটি আত্ম-

প্রকাশ করল, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠল মন। বললাম,—মেনন ?

—কী ?

—ওরা আমাদের কী ভাবছে বলো তো ?

—কী আবার ! জানোয়ার !—ব'লে পাশ ফিরে বেঞ্চির ওপরে সত্যিই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল মেনন।

ঠিক সেই মুহূর্তে, নভোমণ্ডলে, কোন্ গ্রহে কোন্ নক্ষত্রের প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল কে জানে, অকস্মাৎ চারিদিক থেকে যেন আমাদের ঘিরে ফেলল অতিকায় শকুনের দল। হয়তো চক্র দিচ্ছিল মাত্র কয়েকটাই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, রাশি রাশি প্লেন যেন তীব্র, তীক্ষ্ণ, আর প্রচণ্ড শব্দে আমাদের বধির ক'রে দেবে !

মুহর্তের জন্য ওদের ছইয়ের কাছে গিয়ে দেখলাম দুটি মুখ—সেই পুরুষ, আর সেই মেয়েটি ! এদিকে মেনন চীৎকার করছে,—শুয়ে পড়ো মল্লিক, শুয়ে পড়ো। জ্যাপস্ !

পরমুহূর্তেই আরম্ভ হয়ে গেল 'অ্যাক্শান'। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাদের নেই, তারা কিছুতেই অনুভব করতে পারবে না আমাদের সেই ভয়াবহ অবস্থাটা। মেশিনগানের ক্রমাগত কট্-কট্ কট্-কট্—আর কানের কাছ দিয়ে 'সোঁ-ও' ক'রে ছুটে যাওয়া গুলির শব্দ ! একটার পর একটা প্লেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মনে হ'ল যেন ! যতো সহজে কথাগুলো আজ বলতে পারছি, তত সহজ ছিল না ব্যাপারটা ! এক কথায়,—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক বিশৃঙ্খলা !

এম্-এল্টার ছাদ গেল ফুটো হয়ে, ফেটে চৌচির হয়ে। এক সময় একেবারে খসেই পড়ল ছাদ ! আর, তারপরেই পরপর কয়েকটা গুলি এসে লাগল লঞ্চের গায়ে।—কী যে হয়েছিল স্পষ্ট

আজ মনে নেই, আমার বাঁ-হাতে তীব্র যন্ত্রণা! আর ঢেউ,—কলকল খলখল ক'রে সমুদ্রের অজস্র রাশি রাশি ঢেউ যেন আমাকে গ্রাস ক'রে নিলো মুহূর্তে!

চিৎকার ক'রে ডাকলাম,—মেনন?

কিন্তু কোথায় মেনন! কোন দিক থেকে তার কোন সাড়া এল না।

জল—জল আর জল—শুভ্র আর ফেনায়িত ঢেউগুলি সর্পবিষের মতো আমার চোখে-মুখে—সারা গায়ে এসে পড়তে লাগল। পর-মুহূর্তে আমার মাথা ছাড়িয়ে চলে যেতে লাগল উত্তাল উন্মত্ত ঢেউ-গুলো—জলের মধ্যে আমার যেন ক্রমশঃ দম বন্ধ হয়ে আসছে, যন্ত্রণায় বাঁ-হাতটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছিল, সমুদ্রের এ তরঙ্গ-লীলা নয়, যেন হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোকের সমবেত কোলাহল আর করতালি! তারপরে, ঠিক কী যে হয়েছিল, বলতে পারব না।

নীল আর সবুজ, এই দুই রঙে মেশানো রঙীন কাঁচ দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা। রাজপুরী। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি আমার স্বর্গে-যাওয়া মায়েরই কোল। কবে সেই ছোটবেলায় সরস্বতী পূজোর আগে কুল খেয়েছিলাম ব'লে খুব মেরেছিল আমাকে আমার মা, আর তারপরেই দুটি হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিল কোলে, বলেছিল,—কোথায় লেগেছে রে খোকন?

তারপরেই মনে হয়েছিল,—বাবার হাত ধ'রে কোথায় যেন চলেছি। সেই ছোটবেলায় এক-একদিন যেমন বাবার হাত ধ'রে বেড়াতে যেতাম, ঠিক তেমনি। বাবা যেন বললে,—টালিগঞ্জের মেলায় যাবি? মোড়লদের বাড়ি কী সুন্দর সুন্দর পুতুল-নাচ এসেছে, চল তোকে দেখিয়ে আনি।

হ্যাঁ, তলিয়েই যেন যাচ্ছিলাম, দেহচেতনার ঊর্ধ্বে, স্মৃতির অতল-তলে।

মনে হ'ল, শঙ্খ আর ঝিনুকের মেলা চারিদিকে। শঙ্খের মুখের মতো গোল-গোল সিঁড়ি ঘোরানো। কোথাও-কোথাও ধবধবে সাদা দেয়ালের ঘর—তাতে বসানো কতো হীরে-মণি-মাণিক জ্বলজ্বল ক'রে আলোক বিকীরণ করছে!

রূপোর খাটে সেই রূপকথার রাজপুত্রের মতোই আছি যেন চুপচাপ শুয়ে,—শিয়রে আমার 'কুচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল'। আমার মাথায় চাঁপাকলির মতো আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে, কোকিলের মতো মধু-কণ্ঠে বলছে,—জাগো কুমার, জাগো!

বাঁ-হাতে আমার তখনও ব্যথা, তবু শিরে তার করস্পর্শ পেয়ে স্নিগ্ধতায় ডুবে যাচ্ছে শরীর-মন, ঘুম থেকে জাগরণের পথে আসতে আসতে আন্দাজে-আন্দাজেই ওর একখানা হাত নিলাম হাতের মধ্যে টেনে, কী ক্ষুদ্র, অথচ কী নরম সেই জলকন্যার হাতখানা। আঃ!

॥ ২ ॥

তার আশ্চর্য কাহিনী বলতে বলতে কর্নেল মল্লিক হঠাৎ এখানে থেমে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কে একজন ভিতরে এসে একসময় হ্যারিকেনটা রেখে দিয়ে গেছে টেবিলে,—একটা উইয়ে-খাওয়া টুল টেনে হাতের কাছে রেখে গেছে দু'কাপ চা দুটো হাতলভাঙা কাপে।

নড়বড়ে ভাঙা একটা তক্তাপোশের ওপরে বুক পর্যন্ত ময়লা একটা কাঁথা টেনে চুপচাপ শুয়ে ছিল কর্নেল মল্লিক। মেটেবাড়ির দেয়ালগুলির ওপরে এককালে বুঝি চুনের প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল, বহু জায়গাতেই খসে গেছে সেই চুনের শুভ্রতা। মাথার ওপরে খোলার চালের গায়ে-গায়ে—বাঁশের সঙ্গে জড়িয়ে-জড়িয়ে আছে অজস্র ঝুল।

কর্নেল বললে,—ডাক্তার, শুনতে চাও আরও ?

পুরোপুরি 'ডাক্তার' হই নি তখনও, তবে ডাক্তার হবার পথে। কিন্তু জ্বর হয়েছে ব'লে বেছে বেছে আমাকেই কী মনে ক'রে যেন ডেকে আনিয়েছিল কর্নেল মল্লিক বস্তির একটি ছেলেকে দিয়ে। এই পাড়াতেই ছোট থেকে আমি মানুষ, পাড়ার সবাই আমাকে জানে। ছেলেটি বললে,—আমাদের বাড়িওলা আপনাকে ডাকছে। তার খুব জ্বর !

—কে বাড়িওলা ?

—মল্লিক মশাই।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম। 'মল্লিকমশাই' মানে, আমাদের কর্নেল মল্লিক। এখানকার বস্তির একটা খোলার চাল-দেওয়া মেটেবাড়ির তিনি মালিক।

ছেলেটি বললে,—আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। কাকীমা খুব কাঁদছে।

—কাকীমা ! কাকীমা কে ?

ছেলেটি বললে,—মল্লিকমশাইয়ের স্ত্রী।

—স্ত্রী !

অবাক হলাম মনে মনে। মল্লিকমশাইয়ের স্ত্রীর কথা তো কখনও শুনি নি। জানিই না যে স্ত্রী আছে তাঁর !

যাই হোক, কর্নেল মল্লিককে আপনারা চিনলেন কী? আমাদের পাড়ার রাস্তাটা যেখানে ট্রামরাস্তায় এসে মিশেছে, তারই মোড়ে বিরাট একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'শঙ্খ-উপত্যকার ফলাহার-পান্থশালা'।—আমি অবশ্য ইংরেজী কথাটাকে বাংলা ক'রেই বললাম। মাদ্রাজের কোন কোন অঞ্চলে দেখে এসেছি আজকাল 'রেস্টুরেন্ট' বা 'কাফে' প্রভৃতি শব্দগুলিকে মুছে দিয়ে লেখা হচ্ছে, 'ফলাহার পান্থশালা'। আর 'সাঙ্গুভ্যালী' যে 'শঙ্খ-উপত্যকার'ই নামান্তর, এটা কে না জানে ?

এই 'শঙ্খ-উপত্যকার ফলাহার পান্থশালাতেই' নিত্য দু'বেলা আপনি কর্নেল মল্লিকের সাক্ষাৎ পেতে পারেন। বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মতো হবে বয়েস, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ময়লা ধুতির ওপরে তালি-দেওয়া বহু পুরানো কালো সিল্কের একটা লম্বা সেরওয়ানী ধরনের কোট পরনে,—রোজ দু'বেলা একটি কোণ বেছে নিয়ে ব'সে থাকে, খবরের কাগজগুলি ওল্‌টায়, প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় হরফের হেডিং থেকে শেষ পৃষ্ঠার শেষ শব্দ পর্যন্ত কোনটাই পড়া থেকে বাদ পড়ে না, হয়তো একই কথা বার বার পড়ে। মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে ওঠে,—ওহে নিধিরাম, বলি, ফাঁকি দিতে শুরু করলে কবে থেকে? গোবিন্দটাকে পাঠিয়ে দাও তো? ছ্যা—ছ্যা—এই কী চা হয়েছে? বলি, পয়সা দিয়ে চা খাই না, নাকি?

দোকানের কর্তা নিধিরাম কর্নেল মল্লিককে কখনও ঘাঁটাতে সাহস করে না। কেন, তা সে নিজেই জানে। এক কাপ চা নিয়ে সেই সকাল সাড়ে-ছ'টা থেকে হয়তো বেলা বারোটা পর্যন্তই কাটিয়ে দিল কর্নেল। গোবিন্দ-রা অবশ্য তা' ব'লে কখনও তার মাথার ওপরকার পাখাটা বন্ধ ক'রে দেয় না।

অধিকাংশ খদ্দেরই তার চেনা-জানা, বলে,—কানাই নাকি? কাণ্ড দেখেছ জহরলালের? স্রেফ উড়েই বেড়াচ্ছে! এ-দেশ আর সে-দেশ!

—তাতে আপনার কী ক্ষতি হ'ল শুনি?

উত্তেজনায় হয়তো থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে হাত দুটো কর্নেলের। বলে,—ক্ষতির কথা হচ্ছে না! বলি, হিম্মৎ আছে? দেশ-বিদেশ ঘুরুক না,—কিন্তু উড়ে নয়,—জাহাজে,—পাগলা সমুদ্রের ঝড়-ঝাপটা খেয়ে!

কেউ হয়তো ব'লে বসল,—আপনার বুঝি ঝড়-ঝাপটা খাওয়া অভ্যেস!

বুকখানা চিতিয়ে সোজা হ'য়ে ব'সে কর্নেল বলবে,—যে সে ঝড়-ঝাপটা নয়, একেবারে বে-অব-বেঙ্গলের ! ক্ষ্যাপামিতে আটলান্টিক-এর পরে আর যার জুড়ি নেই।

চেনা-জানাদের অন্য কেউ হয়তো ততক্ষণে প্রশ্নকর্তার কনুইতে সবার অলক্ষ্যে একটু ধাক্কা দিয়ে ফিসফিসিয়ে ব'লে উঠেছে,—চেপে যা পচা। আর ঘাঁটাস নি মাইরি। দেখছিস না, মাথায় একটু 'ইয়ে' আছে।

সত্যিই, কর্নেলকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না সহজে। কিন্তু কর্নেল কী নিজেই ছাড়বার পাত্র ? আমাকে প্রায় ছোট থেকেই দেখেছে, তবু নিকেলের চশমার ফাঁকে চোখ বড় বড় ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, বলে,—কে ? আমাদের তারকদার ছেলে সুবোধ না ? ডাক্তারী পড়ছ ? বেশ বেশ। বড় খুশী হলাম। কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরোও, তোমাকে একবার হার্ট-টা দেখাব। মানে—

বাধা দিয়ে ব'লে উঠলাম,—কী হয়েছে আপনার হার্টে ? বলেন তো, যেদিন খুশি দেখতে পারি।

—দূর ! কর্নেল ব'লে ওঠে,—সেদিনের ছোকরা, আমার হার্টের তুমি কী বুঝবে হে ? পাশ ক'রে বেরোও, তখন দেখাব।

আমি বিস্মিত হয়ে ওঁর কথা শুনে ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছি, চায়ের কাপটা ধরে আছি হাতে—মুখে ওঠাচ্ছি না,—তাই দেখে পার্শ্ববর্তী কানাই বললে,—ঘাঁটিও না। জ্বালিয়ে মারবে। বেহেড পাগল একেবারে !

নিধিরাম বলে,—বড় মায়া পড়ে গেছে ওঁর ওপরে। আগে আগে কতদিন বলেছি, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে উঠে যান, অন্য খদ্দেরের অসুবিধে করবেন না। শোনেন না উনি। কতদিন তাড়িয়েও দিয়েছি, রেগেও গেছেন, কিন্তু তবু এসেছেন। বলেছেন, —দেখ নিধি, তোর বাপের আমলের লোক আমি, আমাকে অপমান করিস নি বলছি !

এক-একদিন কাগজ পড়তে পড়তে 'দূর দূর' ক'রে ঠেলে দিয়েছে কাগজটা। বলেছে,—যতো সব বোগাস! বে-অব-বেঙ্গলে মনসুন নামতে এবার দেরি হচ্ছে কেন, সে-সম্বন্ধে একটা আঁচড়ও কাটে নি। আমি হলে তো আস্ত একখানা এডিটোরিয়াল লিখে বসতুম।

কাকে যেন একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—আচ্ছা, উনি সত্যিই কর্নেল নাকি?

—আরে রাম! ছেলেটি বলেছিল,—যুদ্ধের সময় আর্মিতে জয়েন করেছিল, বর্মা-ফর্মা আর কাঁহা কাঁহা মুলুক যেন ঘুরে এসেছে!—যুদ্ধে জাহাজ না মোটর-লঞ্চ ডুবি হয়ে নৌকো চ'ড়ে বুঝি দিনকতক কাটিয়েও ছিল সমুদ্রে, কিন্তু কর্নেল ও কোনকালেই ছিল না। অনবরত যুদ্ধের গল্প করে কিনা, সেই জন্যে পাড়ার ছেলেরা নাম দিয়েছে—কর্নেল মল্লিক। নামটা শুনে খুশীও হয়। কষ্টের সংসার তো,—মাথাখানা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে। কাজ-কর্ম নেই, ঐ বস্তির বাড়িখানিই যা সম্বল।

কী জানি কী ছিল সেদিনকার মনের অবস্থা,—সিনেমা দেখার কথা থাকা সত্ত্বেও গেলাম না আর সিনেমায়, সেই মলিন তক্তাপোশের পাশে নড়বড়ে চেয়ারটায় ব'সে ব'লে ফেলেছিলাম,—বলুন আপনার গল্প, শুনি?

খোলার চাল-ছাওয়া মেটেবাড়ির বস্তি। মেঝেগুলি সিমেণ্ট করা। মাঝখানে বেশ বড় একটা উঠোন, সেটাও আগাগোড়া সিমেণ্ট করা, সেই উঠোনটাকে ঘিরে চারপাশে খোপের মতো ঘর,—একটি ক'রে ঘর আর একফালি বারান্দা। বহু বিচিত্র ধরনের লোক থাকে এ-বাড়িতে, ইস্কুলের মাস্টার থেকে বেবি ট্যাক্সীর ড্রাইভার পর্যন্ত। সদরের পাশেই দু'দিকে দুটো ঘর। এই দুটো ঘরই স্বয়ং গৃহস্বামীর দখলে। বলেন, পাশাপাশি ঘর নিয়ে থাকতে পারতাম, কিন্তু এই-ই বেশ, সদর আর অন্দর। একটাতে আমি থাকি, আরেকটাতে আমার লোকজন।

লোক যে ওঁর কয়জন তা জানতাম না, এই আজ প্রথম জানলাম ওঁর স্ত্রীর কথা। কিন্তু তাঁকে আজও দেখতে পেলাম না। সম্ভবত সেই অন্তরালবর্তিনীরই হাতের তৈরি চা, দু'জনে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগলাম। কর্নেল পর পর কয়েকটা চুমুকেই চা শেষ ক'রে কাপটা ঠক্ ক'রে টুলের ওপরে রেখে আবার তলিয়ে দিলে মাথাটাকে তুলো-বের-করা ময়লা বালিশটার ওপরে। বললে,—তুমি তারকদার ছেলে। তারকদা বড্ড ভালোবাসত আমাকে। এই যে তুমি এসে পাশে বসেছ, মনে হচ্ছে, তারকদা নিজেই এসে বসেছেন। ভালো হাত দেখতে জানতেন, বলতেন, তোর নিশ্চয়ই জলযাত্রা আছে!—বিশ্বাস করতাম না, মনে মনে বলতাম, যত সব বোগাস।—কিন্তু আর্মির লোক হয়েও জলে যেতে হয়েছিল আমাকে। গ্রহের ফের সবই। নইলে বাঙালীর ছেলে আমরা, চিরকাল ঘরকুণো; রকে গিয়ে বসব, রাজা-উজীর মারব,—তা নয় ঘূর্ণির মতো ছুটে বেড়াতে হ'ল এ-দেশ আর সে-দেশ! অবশ্য আমিই বা কেন, কতো বাঙালীর ছেলেকেই না যেতে হয়েছিল যুদ্ধের সময়ে। কেউ ফ্রান্স, কেউ ইটালী, কেউ আমেরিকা, কেউ ইউ-কে। অভিজ্ঞতার আর অভাব আছে নাকি বাঙালীর জীবনে? এই দেখ না, যুদ্ধে যদি নাম না লেখাতুম, যদি জীবনে এই অভিজ্ঞতাটুকু না হতো,—তাহলে শোনাতে পারতাম কি তোমাকে ডেকে এনে আমার এই বিচিত্র কাহিনী?

বললাম,—সে তো বটেই।

বললে,—আমাদের দেশটা ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ছেলেরা আর উপায় না দেখতে পেয়ে চারদিকে ছিটকে পড়েছে। আমি বলি, তাতে ভালো হয়েছে। নানান জীব আর জীবন দেখে বেড়াক বাঙালী ছেলেরা—অনেক কিছু জানতে পারবে, শিখতে পারবে।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল স্তব্ধতায়। তারপর কর্নেল এক সময় ব'লে উঠল,—আমার বাঁ-হাতটা দেখ তো সুবোধ?

একটু অবাক হয়েই বললাম,—বাঁ-হাত ! কেন ?

বলতে বলতে নিজেই বাঁ-হাতখানা তুলে শার্টের হাতাটা গুটিয়ে বাম বাহুর পেশীটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরল। বললে, দেখতে পাচ্ছ ?

বিরাট একটা কাটার দাগ। কাটাই হবে, পোড়ার দাগের মতন দেখতে। ভীষণ কোন দুর্ঘটনায় বাম বাহুর পেশীর কাছটা নিদারুণ জখম হয়েছিল বোধ হয়। কাটা বা পোড়ার জায়গাটা একেবারে অস্বাভাবিক সরু হয়ে আছে,—দেখে মনে হয়, পেশীটা যেন গেছে দু'ভাগে ভাগ হয়ে। সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম,—কীসের এ দাগ ? কবে হয়েছিল ?

কর্নেল আবার নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল। বললে,—সেই কথাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছি। দেখ সুবোধ, আমি জানি এই যে জ্বর হয়েছে, এ ক্রমেই বাড়বে, আমি আর বাঁচব না। বাঁচতে ইচ্ছেও নেই, শুধু—

—শুধু ?

—আমার ঐ স্ত্রীর জন্য। ওর জন্যই জোর ক'রে বেঁচে থাকতে হবে। পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছি—জীবনে সব থেকে যা ঘৃণা করতাম,—পঙ্গু, অসহায় আর নিষ্কর্মার জীবন !—কিন্তু উপায় নেই, সেই ঘৃণা নিয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। কাজ-কর্ম করতে পারি না। দু'-একটা ছুটকো চাকরি নিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলাম না,—কারণে-অকারণে মাথাটা গরম হয়ে যায়—লোকের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে ফেলি ! তাছাড়া···তাছাড়া, লোকে বলে, আমি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। হবেও বা। আমার নাকি কাপড়-চোপড়ও ঠিক থাকত না। কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে সারারাত নাকি ঘরটার মধ্যে পায়চারি করতাম, আর মাঝে মাঝে 'টোম্বি টোম্বি' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠতাম।

—টোম্বি ! টোম্বি কে ?

ম্লান একটু হেসে বললে,—তার কথাই তো তোমাকে বলব।

তারপরেই একটু থেমে দম নিয়ে বলতে শুরু করে,—মাঝে মাঝে তাই আমি ভাবি সুবোধ, কারা সত্য? তারা, না আমরা? সে, না আমি? ভুল করল কে? আমি, না ও?

—কার কথা বলছেন!

অল্প একটু হেসে বললে—আমরা কথায় মত্ত, যে মুখে ঘোমটা টেনে চুপি চুপি এসে আমাদের দু'জনকে দু'কাপ চা দিয়ে গেল?

—উনি তো···মানে—

—হ্যাঁ। আমার স্ত্রী। ঐ ঘোমটার মধ্যেই জীবন কাটছে। কোথাও বেরুবে না, কারও কাছে যাবে না, কারুর সঙ্গে মিশবে না। শুধু আমি আর আমি। কিন্তু কে চায় বলো তো এত সব সেবা? বিছানার চাদর কেচে পরিষ্কার করবে, জামা-কাপড় সাবান দিয়ে ধবধবে ক'রে রাখবে, কিন্তু তাতে যে আমার কতো অস্বস্তি হয়, তা কী ও কোনদিন বুঝবে? জানো সুবোধ, আমি ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে কোহিনূর রাখতে চাই!

—কোহিনূর!

—হ্যাঁ, আমার জীবনের সমস্ত স্মৃতিটুকুই যে একটা মূল্যবান কোহিনূর। বড় যত্নে একে লুকিয়ে রেখেছি। তোমাকে দিয়ে আমি ভারমুক্ত হতে চাই।

প্রচণ্ড ব্যথা আমার এই বাঁ-হাতটায়—তাই নিয়ে 'আঃ-উঃ!' করতে করতে চোখ মেললাম। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই পাতাল পুরীর হীরে-মাণিক-জ্বলা শঙ্খ-ঘর, কোথায় মিলিয়ে গেল রূপোর খাট, কোথায় মিলিয়ে গেল সোনার রাজকুমারী!

চোখ চেয়ে দেখি, সেই নৌকোটার সেই ছইয়ের তলায় আমি শুয়ে। কানে আসছে সমুদ্রের মন্দ্র কল্লোল,—আর ছইয়ের বাইরে

তাকিয়ে দেখতে পেলাম,—দিগন্তে রক্তিম আভা পড়েছে ছড়িয়ে, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

সেই আসন্ন-সন্ধ্যার আলোছায়ায় দেখলাম, আমার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে সেই তিন বছরের শিশুটিকে পাশে বসিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে সেই নিরাবরণ পুরুষটি। আর, আমার কাছে, আমার শিয়রে বসে, আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেই মেয়েটি, তার অন্য হাতটির ক্ষুদ্র নরম মুঠি আমার ডান হাতটার মধ্যে !

॥ ৩ ॥

বেশ কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল আমার সমস্ত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে। আমার মুখের দিকে সেই একইভাবে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। ক্রমশঃ আমার ভিতরে অস্থিরতা জেগে উঠতেই বাঁশের চোঙা-ভর্তি জল নিয়ে এসে সন্তর্পণে মুখে ঢেলে দিতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে।

আঃ! কী ঠাণ্ডা আর মিষ্টি সেই জলের স্বাদ। বেশি অবশ্য দিলো না মুখে, কিন্তু কয়েক ফোঁটা জলেই তৃপ্তি হ'ল আমার তৃষ্ণার। আশ্চর্য হলাম মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার যে সত্যিই তৃষ্ণা পেয়েছিল, কেমন ক'রে তা বুঝতে পারল মেয়েটি ?

কিন্তু, পরক্ষণেই যে অনুভূতিটা এল, সেটা শারীরিক তীব্র একটা যন্ত্রণার। আমার বাঁ-হাতটা পারছি না নাড়তে—গুরুতর জখম হয়েছে হাতটা। চেয়ে দেখি, কী-সব ঘাস-লতাপাতার চাপড়া দিয়ে তার ওপরে আমারই জামাটা ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজের মতো ক'রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। গায়ে আমার জামাটা নেই, পায়ে মোজা-জুতোও নেই, পরনে রয়েছে লম্বা খাঁকীব প্যাণ্টটা। মাথাটা একটু উঠিয়ে চীৎকার করতে গেলাম,—মেনন !

কণ্ঠে স্বর ফুটল, কিন্তু সাড়া পেলাম না মেননের। আবার ডেকে উঠলাম। ততক্ষণে বাচ্চাটার কাছ থেকে ছুটে এসেছে সেই পুরুষটি। তার ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, তাকে যেভাবে নিপীড়িত ক'রেছিলাম দড়ির বাঁধনে, এবার যদি তার প্রতিশোধ নেয় —যদি ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমার টুটি চেপে ধরে!

আত্মরক্ষার্থেই বোধ হয় গিয়েছিলাম উঁচু হয়ে বসতে,—কিন্তু পরক্ষণেই টলে পড়ে গেলাম। বড়ো দুর্বল লাগল নিজেকে, বড় ক্লান্ত। তারপরেই, আর কিছু নয়,—অন্ধকার, কেবল নিশ্ছিদ্র, নিতল অন্ধকার!

জ্ঞান যখন ফিরে এলো, তখন রাত হয়ে গেছে। আবছা আবছা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে নৌকোর পাটাতনের ওপরে। পাটাতনের ওপরে কারা যেন শুয়ে, আর আমার মাথাটা কার যেন উরুদেশে ন্যস্ত। মেনন? ডেকে উঠলাম,—মেনন।

কেউ সাড়া দিলো না। ধীরে ধীরে মুখ তুলে শিয়রের দিকে তাকিয়ে দেখি,—সেই পুরুষটি,—যাকে আমরা হৃদয়হীনের মতো বিনা অপরাধে শক্ত দড়ির বাঁধনে বন্দী ক'রে রেখেছিলাম।

চোখের ওপর জমাট অন্ধকারটা সয়ে এলে, চোখ নাকি তখন কিছু কিছু দেখতে পায়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তখন ছিল না, ছিল জ্যোৎস্নার চাপা আলো। সেই আলোয় লক্ষ্য করলাম, কী যেন ইঙ্গিতে আমাকে বলছে লোকটি।

প্রথমে বুঝতে পারি নি, পরে বুঝতে পারলাম, লোকটি জানতে চাইছে,—খিদে পেয়েছে কী?

মাথা নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

আমার মাথাটা উরু থেকে সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে চেঁচিয়ে কী যেন ব'লে উঠল সে। তার মধ্যে 'আনা' শব্দটা উচ্চারিত হ'ল বার কয়েক। দেখতে পেলাম, সামনের পাটাতন থেকে উঠে দাঁড়ালো

একটি ছায়ামূর্তি, তারপরে ছইয়ের কাছাকাছি এসে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকল। বুঝলাম,—সেই মেয়েটি। কিন্তু মেনন কোথায় ?

আবার চেঁচিয়ে ডাকলাম,—মেনন ?

এবারেও কোন সাড়া নেই। অনুভবে বুঝলাম, নৌকোটার একটা গতি আছে। সমুদ্রে ঢেউও বুঝি হ'য়ে উঠেছে উত্তাল,—নৌকোটা একবার উঠে যাচ্ছে বেশ-কিছু উঁচুতে, পরক্ষণেই নেমে যাচ্ছে নিচে; নিচে নামবার সময় আমার শরীরে—শিরদাঁড়ায় সিরসির ক'রে একটা ঠাণ্ডা স্রোতও যাচ্ছে বয়ে।

কিন্তু নৌকোর পাশে বাঁধা আমাদের ছাদ-ভেঙে-পড়া সেই লঞ্চটা কি নেই ? কোথায় গেল মেনন ?

ততক্ষণে ওদের নারীপুরুষে কী যেন কথাবার্তা হ'য়ে গেল। পুরুষটি চলে গেল বাইরে, আর মেয়েটি ছইয়ের পাটাতনের এক অংশ সরিয়ে নিচে হাত দিয়ে নিয়ে এল বাঁশের চোঙা আর একটা চুবড়ি। আমার শিয়রের কাছে সরে এসে তেমনি ফোঁটা ফোঁটা জল ঢেলে দিল আমার মুখের মধ্যে। তারপরে পর পর গোটা তিনেক পোড়ানো চাঁদামাছ খাইয়ে দিল আমাকে ধীরে ধীরে, সযত্নে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম,—মেনন ?

'মেনন' যে একজনের নাম এবং সে লোকটা যে কে, তা ওরা ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে। ইঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি ক'রে, কী যেন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল মেয়েটি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার তা' বোধগম্য হ'ল না।

মরিয়ার মতো হ'য়ে বাঁ-হাতটা কোনক্রমে টেনে-টুনে উঠে বসলাম এবারে। মেয়েটি বাধা দেবার পূর্বেই দুর্বল দেহটাকে টানা-হেঁচড়া ক'রে ছইয়ের সামনে নিয়ে এলাম। কিন্তু, কোথায় সেই মোটরলঞ্চ, আর, কোথায় আমার পরম বন্ধু মেনন ?

সাপের মাথার মণির মতো ফসফরাস-জ্বলা সমুদ্রের ঢেউগুলো

কাকে যেন খুঁজে মরছে! না আছে লঞ্চের কোন চিহ্ন, না আছে মেননের! বুঝতে পারলাম। বুকের মধ্যে রুদ্ধ একটা আবেগ ঐ সমুদ্রের অন্তঃশীলা স্রোতের মতোই গুমরে গুমরে উঠল! হুহু-করা বাতাস যেন এসে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দিচ্ছে, বলছে, নেই—নেই—সে নেই!···

—মেনন!—ব'লে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতে গিয়ে মাথাটা আবার হঠাৎ ঘুরে গেল, ঐখানেই লুটিয়ে পড়ে গেলাম। সম্পূর্ণ চেতনা আমি হারাই নি,—কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলাম। মেয়েটি হাঁক দিয়ে পুরুষটিকে কী যেন বললে, সে-ও উত্তরে কী-সব বলতে লাগল, তার মধ্যে 'আনা' শব্দটা আবার উচ্চারিত হ'ল বারকয়েক। দু'তিনবার কথা কাটাকাটির পর পুরুষটি এল আমার কাছে, শিশুর মতো দু'হাতে মুহূর্তে তুলে ধরল আমাকে, তারপরে নিয়ে গিয়ে আবার শুইয়ে দিল ছইয়ের ভিতরে, ঠিক সেই আগের জায়গাটিতে।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলাম। মাথার নিচে বালিশের পরিবর্তে কাঠের কী-একটা রেখে গেল, তাতে মাথা রেখে অসুবিধা বোধ করলাম না মোটেই, বরঞ্চ ঘাড়ের নিচে একটু চাপ বোধ হওয়াতে কিছুটা আরামই পাওয়া গেল।

তারপর কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ। ওরা দু'জনেই বোধ হয় কিছুক্ষণ বসে ছিল আমার পাশে। নিম্নকণ্ঠে কী-যেন বলাবলি করছিল ওরা দুর্বোধ্য ভাষায়। একবার, মেয়েটি বোধ হয় উঠে বাইরে বাচ্চাটির কাছে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে মেয়েটি কী যেন জিজ্ঞাসা করল, ভিতর থেকে সাড়া দিল পুরুষটি। তারপরে মনে হ'ল, শিশুটি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। ক্রোধ আর বিরক্তি-মিশ্রিত শিশুদের কান্নার মতোই তার কান্না। মনে হ'ল ওকে এরা ভিতরে নিয়ে আসতে চায়, কিন্তু সে কিছুতেই আসবে না। বোধ হয় তার

হাত ধ'রে তার মা টানাটানিও করল কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না তাতে। অগত্যা, ভিতর থেকে কী যেন একবার হেঁকে বলল পুরুষটি, তারপরে উঠে বাইরে গেল চলে। পরমুহূর্তেই, পায়ে পায়ে মেয়েটি চলে এল ভিতরে। আর আশ্চর্য, ধীরে ধীরে সে একসময় শুয়ে পড়ল ছইয়ের মধ্যে প্রায় আমার পাশেই।

নির্জীবের মতো কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই, হঠাৎ যেন ফিরে এল চেতনা। আর ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল বাঁ-হাতের সেই ব্যথাটার তীব্রতায় বুঝি মরে যাব! মাথাটাও ধরেছে, যেন ছিঁড়ে পড়ে যাবে। হাত-পা থরথর ক'রে কাঁপছে, আগুন ছুটছে যেন ছু'চোখ দিয়ে! আর, হাড় কাঁপিয়ে এসেছে শীত। এটুকু বুঝেছিলাম, এসেছে জ্বর—প্রবল জ্বর।

বেশ মনে আছে, এইভাবে প্রায় অজ্ঞান আর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কেটে গিয়েছিল কয়েকটা দিন, কয়েকটা রাত। রাত্রি হ'য়ে আসাও যেমন বুঝতে পারছিলাম, তেমনি, দিনের আলোও। আর শিয়রে অক্লান্ত সেবায় মগ্ন ছিল ছুটি মুখ। ঢেউ খেলানো কেশ-বন্যায়-ঢাকা সেই মেয়েটির কোমল মুখ, আর অসমসাহসী সেই পুরুষটির স্নেহস্পর্শ।

যেদিন জ্বর গেল ছেড়ে, যেদিন ফিরে এল পুরোপুরি জ্ঞান—সে-ও এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিই বটে,—ক্লান্ত, দুর্বল শরীরে আর মনে কেমন যেন একটা প্রখর অনুভূতি জেগে উঠল। যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বের অত্যাশ্চর্য রহস্যেরও যিনি অধিকর্তা, তিনিই জানেন,—যা হবার নয় তাই হয় কী ক'রে, যা ঘটবার নয় তা' ঘটে কী ক'রে? যেখানে বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব, সেখানেও মানুষ ক্রমে ক্রমে মানিয়ে নেয় কী ক'রে? পঙ্গুকে যিনি দুর্গম গিরি লঙ্ঘনের শক্তি দেন, তিনিই উদ্ঘাটিত করতে পারেন এইসব কার্যকারণের রহস্য!

ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি, জ্যোৎস্নার প্লাবন ডেকেছে যেন সারা সমুদ্র জুড়ে। বাঁ-হাতটার সেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর না থাকলেও ব্যথা আছে, হাতটা তখনও নাড়তে পারছি না। তবু, উঠে বসলাম ধীরে ধীরে। বাইরের খোলা হাওয়ায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে পিতা-পুত্র। ছইয়ের মধ্যে—মেয়েটি। বাইরের এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে তার মাথায়, তার বুকে! আর দুরন্ত হাওয়ায় উড়ছে তার অলকগুচ্ছ। আমি আবার যখন শুয়ে পড়লাম ঘাড়ের নিচ থেকে ওদের সেই কাঠের বালিশটা সরিয়ে,—তখনও সেই খোলা চুল হাওয়ায় আমার মুখের ওপর আর হাতে এসে পড়ে কৌতুক করতে লাগল বারংবার!

শুয়ে-শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম নিজের অবস্থাটা। ভালো-লাগা গানের একটা রেকর্ডই যেমন গ্রামোফোনে বার বার লোকে বাজিয়ে বাজিয়ে শোনে, তেমনি ঘটনাটা আবার ভাবতে লাগলাম প্রথম থেকে। মেনন যে বেঁচে নেই, তা' বুঝতে পেরেছি। আমাদের 'এম-এল্'টা যে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁজরা হ'য়ে ডুবে গেছে, তাও বুঝতে আমার বাকি নেই। বুঝতে বাকি নেই যে—ডুবে যাচ্ছিলাম আমিও। কিন্তু এরা দয়াপরবশ হ'য়ে আমাকে উদ্ধার করেছে, যেমন ক'রেই হোক। আর একটা সত্য এই, জাপানীরা এদের কিন্তু কোন ক্ষতি করে নি।

কিন্তু, আমাকে ওরা বাঁচাল কেন? আমার বাঁ-হাতে যে গুলি লেগেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হয়তো প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। সে রক্ত বন্ধ করলই বা কেমন ক'রে? আদিবাসী ওরা, ওদের কাছে কী গাছগাছড়ার কোন ওষুধ আছে? কী জানি, কী আছে ওদের পাটাতনের নিচে লুকানো রসদ-ভাণ্ডারে! প্রবল জ্বর হয়েছিল আমার, সে-জ্বরেরও কী কোন চিকিৎসা করেছিল ওরা?

ভাবতে ভাবতে চোখের কোণ উঠল ভিজে। আমরা 'এম-এল্'

নিয়ে এসে ওদের ওপর বাজপাখির মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, কেড়ে নিয়েছিলাম জোর ক'রে ওদের খাবার, শিশুটিকে ভয় পাইয়ে দিয়ে মেরেই ফেলেছিলাম প্রায়, আর প্রচণ্ড অত্যাচার করেছিলাম ঐ পুরুষটি ওপরে। শক্ত দড়ির বাঁধনে তাকে আগাগোড়া বেঁধেছিলাম, বেশ মনে আছে, দড়িটা যেন তার গায়ে কেটে কেটে বসে গিয়েছিল।

শুনেছিলাম, প্রতিহিংসাপরায়ণ এই আদিবাসীরা। কিন্তু কোথায় প্রতিহিংসা, কোথায় ক্রোধ, কোথায় উষ্মা, কোথায় বিরক্তি, কোথায় ঘৃণা?—নারী-পুরুষ তু'জনেই সেবা ক'রে স্নেহস্পর্শ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলল, করল নতুন জীবন দান! কিন্তু কেন?

খ্যাপা হাওয়ায় উড়ে বার বার ঘুমন্ত মেয়েটির কেশকলাপ একরাশ রেশমের মতোই আমার চোখে-মুখে এসে পড়ছে। শুয়ে শুয়েই ওর দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হ'ল, সত্যিই বুঝি ও রাজপুত্রী,—কোমল তনু—কোমল-মন উদ্বেলিত সমুদ্রের জলকন্যা!

ঘুমের ঘোরে ওর একটা হাত এসে এইসময় পড়ল আমার পাশে। অসীম কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হ'য়ে আছে মন—তত্নপরি এই নিঃসীম সমুদ্র-বক্ষে কে আমার বন্ধু,—কে আমার রক্ষাকর্তা ওরা ছাড়া? উদ্বেলিত স্নেহে ধীরে ধীরে তুলে নিলাম সেই হাতখানা। হাতের মুঠিটুকু. ভারী ছোট ভারী নরম!

হাতটা নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ দেখি, আমার দিকে ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরেছে। উদ্দাম উচ্ছল কেশবন্যায় মদির জ্যোৎস্নার ঢেউ, চক্ষের পল্লবে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি। ধীরে ধীরে একসময় নিবিড় ক'রে টেনে নিলাম হাতখানা। মুখের কাছে এনে আমার অধর-প্রান্তে ছুঁয়ে দিলাম পাখির বুকের মতো নরম সেই মুঠিটুকু।

থরথর ক'রে হাতখানা উঠল কেঁপে। পর মুহূর্তেই দেখলাম জেগে উঠেছে আমার রাজকন্যা! ধীরে ধীরে মাথা তুলল সে,

মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলি সরিয়ে নিল একপাশে, তারপর ছুটি বিস্মিত, বিহ্বল চোখ মেলে এগিয়ে এল সে আমার কাছে। আধ-শোয়া, আধ-বসার মতন বাঁ-হাতে ভর রেখে নিষ্পলক চেয়ে রইল সে আমার দিকে। যেমন ক'রে ধীরে ধীরে রক্তরবি দেখা দেয় দিগন্তের তীরে, ঠিক তেমনি ক'রে ঠোঁটের কোণে দেখা দিল হাসির রেখা! উজ্জ্বল, দীপ্ত এক আভায় ভ'রে গেছে তার মুখ।

তার ডান হাতখানা আমার ডান হাতের মধ্যে আবার টেনে নিয়ে আমার বুকের ওপরে ধরলাম চেপে,—বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলাম,—কী সুন্দর তোমাকে লাগছে দেখতে!

আমার ভাষা কী সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল? কথা নয়, সে বুঝেছিল—ভাব। নিশ্চয়ই বুঝেছিল! পুরুষের চোখের যে ভাষা বুঝতে কোন নারীই ভুল করে না,—এই অসভ্য আদিবাসী নারীটিও তা' বুঝে নিতে ভুল করে নি।

হেসে ফেলল সে। ছোট্ট ছুটি-একটি কথা কী যে সে বলল, বুঝতে পারি নি। মনে হ'ল, যেন বলতে চায়—আমি সুন্দর! তাই বুঝি?

মুক্তোর মতো ছোট ছোট ঝকঝকে দন্তপঙক্তিও ওর অপূর্ব। ওর হাতখানা তখনও আমার হাতের মধ্যে। হঠাৎ করল কী, হাতখানা টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে রাখল আমার ঠোঁটের ওপরে,—রেখে কী যেন ইঙ্গিতে বলতে চাইল আমাকে।

বুঝতে পারলাম! সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা মুখের কাছে এনে নিবিড় ক'রে ছুঁয়ে দিলাম আগের মতোই। আবার তেমনি থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল ওর হাতখানা,—অদ্ভুত এক বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এ যেন অনাস্বাদিতপূর্ব এক মধুময় আস্বাদ ওর কাছে!

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে ভেসে এল সেই পুরুষটির কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি ওর হাতটা ছেড়ে দিলাম আমি। ও কিন্তু

কোনরকম চমকে উঠল না, বা অপ্রতিভ হ'ল না। তেমনিই বসে রইল, শুধু মুখ ফিরিয়ে সহজভাবে কী যেন বলে উঠল পুরুষটিকে।

এমনিভাবে কী যেন প্রশ্নোত্তর চলল কয়েক মুহূর্ত দু'জনের মধ্যে। 'অয়' বলে মেয়েটি একসময় উঠে দাঁড়াল, তারপরে চলে গেল আমার শিয়রের দিকে ছইয়ের বাইরে। তারপরে, সেখানে দাঁড়িয়ে নৌকোর হালটা ধ'রে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে লাগল। আর আশ্চর্য, গতিবেগ বেড়ে গেল নৌকোর, সেটা বেশ বুঝতে পারলাম। চেঁচিয়ে পুরুষটিকে কী যেন বলে চলে এল ভিতরে, তেমনি ক'রে আবার বসল এসে আমার পাশে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই 'আনা-আনা' ক'রে আবার ডেকে উঠল পুরুষটি। কী যেন আরও বলল। উত্তরে ছইয়ের ভিতর থেকে দুটো-একটা কথা বলে উঠল মেয়েটি। শেষে 'অয়' বলে উঠে দাঁড়াল, যেতে যেতেও আমার দিকে ফিরে একটু মুচকি হেসে চলে গেল বাইরে। তারপরে বসল গিয়ে সেই পুরুষটির পাশে ঘন হ'য়ে।

আবার ঘুমের ঘোর নেমে এসেছিল দু'চোখ ভরে। জেগে যখন উঠলাম, রীতিমত সকাল হ'য়ে গেছে তখন। উঠে বসে দেখি, ওরা একে একে সামনের গলুয়ের কাছে চলে গেল, তারপরে কী একটা অবলম্বন ক'রে নৌকোর বাইরে নৌকোর গা বেয়ে নেমেও গেল। বুঝতে পারলাম। তখনও ব্যথা বাঁ-হাতে, সেই অবস্থায় আস্তে আস্তে একসময় এগিয়ে গেলাম গলুয়ের কাছে। ঝুঁকে দেখি দড়ির একটা সিঁড়ি ঝুলে রয়েছে নৌকোর গা ঘেঁষে। নামতে গেলাম, কিন্তু এক হাতে আমার পক্ষে তা' সম্ভব হ'ল না, ছুটে এল সেই পুরুষটি, ধ'রে রইল শক্ত ক'রে আমার হাত। তার

সাহায্য না পেলে দড়ির সিঁড়িতে নামা আমার পক্ষে সত্যিই সম্ভব হতো না।

সমুদ্র তখন খুবই শান্ত। ছোট ছোট নরম মুঠির মতো ছোট ছোট ঢেউ এদিকে-ওদিকে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে মাত্র, মৃদু কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গীত তুলে। দিগন্ত জুড়ে সাদা মেঘের দল চলেছে ভেসে, তারই ছায়া প'ড়ে দিগন্তে একটা সুস্পষ্ট সরল রেখা ফুটে উঠেছে! হঠাৎ দেখলে তীরভূমি বলে প্রতীয়মান হয়,—কিন্তু কোথায় তীর?

ছইয়ের কাছে বসে বসে তারপরে দেখতে লাগলাম ওদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। বাচ্চাটা আমার পাশ কাটিয়ে ভয়ে ভয়ে এতক্ষণে ছইয়ের মধ্যে চলে গেল, তাও মায়ের সাহায্য নিয়ে। মা ওর হাতে একটা শুকনো মাছ আর ছুটো শুকনো নারকেলের সরু টুকরো ধরিয়ে দিয়ে আবার চলে এল বাইরে। যেখানে ছুই পাটাতন বিভক্ত হ'য়ে একটা শূন্য স্থানের সৃষ্টি করেছে, সেখানকার কিছু-কিছু কাঠ সরিয়ে ওরা ছু'জনে ভিতরে চলে গেল। উঁকি দিয়ে দেখলাম, অজস্র শুকনো পাতা, চেরা কাঠ আর নারকেলের ছোবড়া সাজানো। অতিকায় নারকেলের খোলাও দেখলাম রয়েছে কয়েকটা। এইগুলিই বোধ হয় ওদের থালা-বাটি বাসন-কোসনের কাজ করে।

ভাণ্ডার থেকে বাইরে এল মেয়েটি। এসে সামনের গলুইয়ের কাছে চলে গেল। সেখানেও পাটাতনের এক জায়গায় কোন কাঠ নেই, নৌকোর খোল পর্যন্ত দেখা যায়। কী-সব নিয়ে সেখানে নেমে গেল মেয়েটি। একটু পরেই ধোঁয়া দেখা গেল সেইখানে।

পুরুষটি ভাণ্ডার থেকে কতগুলি খোলা ছাড়ানো আস্ত নারকেলের শাঁস বার ক'রে নিয়ে এল। খাঁড়ার মতো চক্‌চকে একটা জিনিস দিয়ে সেই গোলাকার আস্ত শাঁস কেটে কেটে

রাখতে লাগল। কয়েকটা খণ্ড কাটা হ'য়ে যেতেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর কয়েকটা বড়ো বড়ো খণ্ড নিয়ে এসে দিল আমাকে। ইঙ্গিতে জানাল, কিছু তুমি খাও, আর পারো তো গলুইয়ের সামনে গিয়ে মেয়েটিকে দিয়ে এসো।

মেয়েটির কাছে গিয়ে তাকে দিতেই সে হেসে ফেলল। এক টুকরো চিবিয়ে বাকিটা রেখে দিল কাছে। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সব ক'টা টুকরোই শেষ করলাম। মেয়েটি মাটির-ডেলা-দিয়ে তৈরি হাঁসুলীর মতো দেখতে একটা জিনিস পেতে তাতে কাঠ-কুটো দিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে নারকেলের একটা মালা থেকে খণ্ড খণ্ড কী-সব তুলে নিয়ে একটা চিমটের মতো জিনিস দিয়ে সেগুলি পোড়াতে শুরু করলে, আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী গন্ধে ভরে গেলে চারিটা দিক।

আমি ঐখানেই বসে ওর কাজ দেখতে লাগলাম। কাজের ফাঁকে এক সময় আমার দিকে তাকাতেই ইঙ্গিতে বলে উঠলাম,—একটু জল দিতে পারো? খাবো?

আমার ইঙ্গিত-টিঙ্গিত সহজেই আজকাল ওরা বুঝতে শুরু করেছে। 'অয়' বলে উঠে দাঁড়িয়ে ছইয়ের ভিতরে চলে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম 'অয়' মানে কী! 'অয়' মানে 'আচ্ছা'।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি এল হাতে সেই রকম একটা বাঁশের চোঙ্ নিয়ে। চোঙটা হাতে নিয়ে পাশে রাখলাম সন্তর্পণে। তারপর ব্যথায়-চিন্‌চিন্‌-করা বাঁ-হাতটা কোনক্রমে সামনে নিয়ে এলাম। বাঁ-হাতে যে ঘাটা হয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা রয়েছে, নাড়লেই ব্যথা লাগে, কেমন-একটা অদ্ভুত অস্বস্তি! ওকে ইঙ্গিতে বললাম,—আমার হাতের ন্যাকড়াটা খুলে দেবে?

ওর চোখে-মুখে প্রথমে বিস্ময়, তারপরে ভীতি ফুটে উঠলেও বার বার অনুনয়-বিনয় করতে, শেষে সে এগিয়ে এসে সযত্নে

খুলে দিল কাপড়টা। কাপড়টা সরাতেই দেখি ঘাসের মতো কী-সব দ্রব্য চাপড়ার মতো ক'রে লাগানো। ইঙ্গিতে বললাম,—এটাও খুলে দাও।

আমার সামনে এসে হাঁটু মুড়ে ভালো ক'রে বসে সেই ঘাসের চাপড়া ধীরে ধীরে খুলতে লাগল। এক-একবার টান পড়তেই 'আঃ' 'আঃ' ক'রে বেদনায় চীৎকার ক'রে উঠলাম। আমার চীৎকার শুনে ছইয়ের কাছ থেকে পুরুষটি কী যেন প্রশ্ন করল মেয়েটিকে। আন্দাজে বুঝলাম, আমার কী হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছে।

মেয়েটি উত্তরে সম্ভবতঃ জানাল আমার অবস্থাটা। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, সব কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছে পুরুষটি। সে এসে সমস্তটা দেখেই কী-যেন আবার বলল মেয়েটিকে। তারপরে চোঙা থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল সেই ঘাসের চাপড়ার ওপরে।

ঘাসের চাপড়াটা ফোঁড়ার-ওপর-থেকে-তোকমারীর পুলটিশ উঠে যাবার মতো সম্পূর্ণ উঠে যেতেই যা দেখলাম বাঁ-হাতের অবস্থা, তা' ভয়াবহ,—শিউরে উঠতে হয় সে-দৃশ্যে। প্রায় ছ' আঙুল পরিমাণ লম্বা কাটা দাগ, মাংস ফেটে হাঁ হ'য়ে আছে,—সেই হাঁয়ের মুখে আটকে রয়েছে মেশিনগানের ছোট্ট একটা গুলি।

পুরুষটিও ভালো ক'রে দেখল গুলিটা, কিন্তু দেখে থতমত খেয়ে গেল, বুঝতে পারলো না কিছুই। মেয়েটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল শুধু, আমার দিকে।

প্রথমটা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল মাথার মধ্যে। পরে যে চিন্তাটা এল, সেটা এই,—এরা রক্ত যদি বন্ধ না করতে পারত, তাহলে আমার মৃত্যু ছিল অবধারিত। দ্বিতীয়ত, এই অদ্ভুত ঘাসের চাপড়া যদি ওরা না লাগাত—ঘা উঠত নিশ্চয় বিষিয়ে। সে-ও

হতো প্রাণঘাতী আমার পক্ষে। মনে মনে ওদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্যাণ্টের পকেটে হাত দিলাম। ছোট্ট একটা ছুরি ছিল পকেটে। ওদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখেই বার করলাম সেই ছুরিটা। নিজেই নিজের ওপরে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে হাতটা বেশ কাঁপতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই।

শেষে মরিয়া হয়ে তীব্র ব্যথাটাকে উপেক্ষা ক'রেই সেই ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোনক্রমে শেষ পর্যন্ত বার ক'রে ফেললাম গুলিটা। এ-কাজটা নিজেই যে কেমন ক'রে সেদিন করতে পেরে-ছিলাম, তা ভাবতে গেলে আজও অবাক হ'য়ে যাই। বুঝতে পারলাম, মানুষ যখন উপায়ান্তর বিহীন হ'য়ে পড়ে, যন্ত্রণার তাগিদে সবই সে করতে পারে। নইলে অস্ত্রোপচার তো বটেই,—যে-লোক ছোট বেলায় জল দেখলে ভয় পেতো,—প্রকাণ্ড নদী পার হতে গেলে বড়ো বয়সেও যার রীতিমত বুক কাঁপত ভয়ে,—সেই আমি দিনের পর দিন এভাবে সমুদ্রে কাটাচ্ছি কী ক'রে, তা-ও ছোট একটা কাঠের নৌকোয়, অজানা অচেনা পরিবেশে!

যাই হোক, ছুরি দিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে গিয়ে আবার বার হ'ল রক্ত। আমি গুলিটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে ছুরিটা পকেটে রাখতে-না-রাখতেই পুরুষটি আবার নিয়ে এল ঐরকম ঘাসের মতো জিনিস, সেটা দু'হাতে থেঁতলে থেঁতলে বসিয়ে দিল ঘায়ের ওপরে। আশ্চর্য ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ সে-জিনিসটা। তারপরে আমারই জামার ছেঁড়া অংশ দিয়ে মুছিয়ে দিল রক্তের ধারা। শেষে রক্তসুদ্ধ ন্যাকড়াটা ফেলে দিল সমুদ্রে। কী সব লতা-তন্তু দিয়ে যেন আবার বেঁধে দিলো হাতে, সেই ঘাসের চাপড়ার ওপরে। রক্ত তো বন্ধ হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, ব্যথাও বুঝি সেরে গেল মুহূর্তে। হাত নাড়লে ঘা-টা কটকট ক'রে ওঠা ছাড়া আর কোন উপসর্গই রইল না।

বেশ কিছুক্ষণ তারপরে কেটে গেল সকালবেলার স্নিগ্ধ রৌদ্রে

সেই পাটাতনের ওপরে বসে। পুরুষটি যথাস্থানে গিয়ে তার কাজ করছে, মেয়েটিও তার তথাকথিত রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আমি নৌকো-চলার ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে করতে বিস্মিত হ'তে লাগলাম।

এক হাল ছাড়া নৌকোর আর কিছু নেই। মাস্তুল আছে, অথচ পাল খাটানো নেই, এবং নৌকোর গতিবেগও উপেক্ষণীয় নয়। অনেক চেষ্টার পর নিজেই ভেবে ভেবে আবিষ্কার করলাম রহস্যটা। আর, আবিষ্কার ক'রে বিপুল শ্রদ্ধায় ভরে গেল আমার মন। স্মরণে এল মেননের কথা। সেই যে বলেছিল, বিস্মিত হ'তে হয় এদের নেভিগেশনের অভিজ্ঞতা দেখে,—কথাটা ঠিক।

সমুদ্রে সবসময়ই আঁকাবাঁকা স্রোত বয় তা' আমরা জানি। ইংরেজীতে যাকে বলে 'কারেন্ট' আর 'ক্রসকারেন্ট,—তারই খেলা চলে সমুদ্রে অনুক্ষণ। বার বার এই যে সমুদ্রে স্রোত পরিবর্তন ঘটে, তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে এরা এত বেশি প্রাজ্ঞ যে হালটা সেই সব স্রোতের ঠিক অনুকূলে ঘুরিয়ে ছইয়ের সঙ্গে যে কাঠের দণ্ডটা সংলগ্ন রয়েছে, তার সঙ্গে বেঁধে রাখে। ব্যস, আর কাউকে কিছু করতে হয় না—নৌকো চলতে থাকে আপনার বেগে।

কতক্ষণই বা লাগল মেয়েটির রান্না করতে! সব সেরে-টেরে তার টুকিটাকি গৃহস্থালির দ্রব্য যথাস্থানে রেখে দিয়ে একবার চলে গেল পুরুষটির কাছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে গেল ছইয়ের মধ্যে ছেলেটার সান্নিধ্যে। তারপরে হাসি-হাসি মুখে চলে এল আমার কাছে। কোন লজ্জা নেই,—সঙ্কোচ নেই,—হাত-পা ছড়িয়ে বসল এসে আমার কাছ ঘেঁষে।

মুখের দিকে চেয়ে কী যেন সে বললে, বুঝলাম না। শুধু দেখলাম এরই মধ্যে একটু সেজে এসেছে। সাজ মানে, কানে দুটো ছোট ছোট সাদা ঝিনুক পরেছে মাকড়ির মতো। ঝিনুক ফুটো ক'রে নারকেল ছোবড়ার আঁশ-থেকে-বের-করা সুতো দিয়ে বাঁধা। গলায় রঙ-বেরঙের ঝিনুকের মালা, কোমরেও তাই। অবশ্য

কোমরে বলা ভুল হ'ল, ছোট ছোট নগ্ন ছেলেমেয়েরা গ্রামাঞ্চলে যেমন কালো সুতোর ঘুনসী বেঁধে রাখে,—এরও ব্যাপারটা হ'ল সেই রকম। উরুসন্ধির মাঝে ঝুলছে—বেশ বড়ো একটা সাদা ঝিনুক। মন্দ লাগছে না, কিছুটা সভ্যতার প্রলেপও বটে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, সংজ্ঞা কী সভ্যতার? এ কয়দিনেই দেখে দেখে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে আমার চোখ,—এদের নিরাবরণ দেখে আর তো কিছুই মনে হয় না! কোনরকম অস্বাভাবিকই মনে হয় না এদের আচরণ। বরং এই উধাও সমুদ্রের পরিবেশে এদের এই স্বাস্থ্যসমৃদ্ধির নিরাবরণ প্রকাশই যেন অপূর্ব ছন্দোময় মনে হ'তে লাগল।

মাদ্রাজ উপকূলে যে ধীবররা সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে, তাদের দেখেছি গায়ের ঊর্ধ্বাঙ্গে ফতুয়া থাকলেও নিম্নাঙ্গে সংক্ষিপ্ততম নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই বেশে তারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে, কোন বিকার নেই, কিছু নেই,—সুসভ্য পথচারীরাও কিছু মনে করে না ওদের ওভাবে দেখে।

এইসব এক মনে বসে বসে ভাবছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার দিকে তাকিয়েই মিটিমিটি হাসছে মেয়েটি। আমার চোখে চোখ মিলতেই নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে উঠল,—আনা।

তখনও ওর দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছি দেখে আমার ডানহাতখানা টেনে নিয়ে নিজের গলার কাছে ছোঁয়ালো, বলল,—আনা।

বুঝলাম ওর ইঙ্গিত। এবং এতক্ষণে বুঝলাম, 'আনা' ব্যাপারটা কী। 'আনা' হচ্ছে ওর নাম।

আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,—টুহি।

বুঝলাম, কী ও বলতে চায়। কিন্তু আমার নাম 'টুহি' হবে কেন?

নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজের আসল নামটা বলে ফেলেই

প্রতিভ হলাম। এত বড়ো নাম ওরা উচ্চারণ করবেই বা কেমন ক'রে, মনেই বা রাখবে কী ক'রে ? জিজ্ঞাসা করলাম নিজের বুকে হাত দিয়ে, 'টুহি ?' অর্থাৎ, আমার নাম তাহ'লে রইল টুহি ?

ওপরে নিচে মাথা সঞ্চালন করল দ্রুত, বললে,—'অয়-অয় !' অর্থাৎ, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

তারপরে, দূরে ছইয়ের দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে বুঝিয়ে দিল, ঐ যে বাচ্চাটা ? ঐ বাচ্চাটার নাম হচ্ছে—টোম্বি।

—টোম্বি ?

—অয়। টোম্বি !

বলেই চুপ ক'রে গেল সে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে পুরুষটিকে ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম,—ওর নাম কী ?

বুঝতে পারল আমার প্রশ্ন। কিন্তু, মুহূর্তে সলজ্জ আরক্তিম একটা আভায় ভরে গেল ওর মুখ। আমাদের মেয়েদের মতো স্বামীর নাম ওদেরও কী আনতে নেই নাকি মুখে ?

নিচু-করা-মুখ ব্রীড়াবনতা মেয়েটির চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা আস্তে আস্তে তুলে ধরলাম, বললাম,—উঁ ? অর্থাৎ, কী হ'ল, দাও আমার প্রশ্নের উত্তর ?

ও-ও উত্তর দেবে না, আমিও ছাড়ব না। শেষে অদ্ভুত একটা ফিসফিস-করা সুরে উত্তর দিল,—'পাওয়া !'

অস্ফুট কণ্ঠে দু'তিনবার নিজের মনেই উচ্চারণ করলাম কয়েক-বার নামটা, 'পাওয়া—পাওয়া।'

আমার মুখে কথাটা শুনে মুখ তুলে তাকাল, তেমনি লজ্জারুণ মুখখানা। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছিলাম সেইসময় দুটি চোখের দৃষ্টি দেখে। ছোট ছোট চোখদুটি যেন মন্ত্রবলে বড়ো বড়ো টানা-টানা হয়ে গেছে, আর উজ্জ্বল এক সপ্রেম স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন প্রদীপের মতো ফুটে উঠেছে দুটি চোখে। বললাম,—আনা !

—উঁ ?

আমার দিকে সেইভাবে তাকাতে তাকাতে হঠাৎই চাপা আর অস্ফুট স্বরে বলে উঠল আমারই দিকে তাকিয়ে,—'পাওয়া!'

বলেই আবার মুখ লুকালো সলজ্জ ভঙ্গিমায়। আর, সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হ'ল, ঐ পুরুষটির নাম ঠিক 'পাওয়া' নয়। 'পাওয়া' বোধ হয় এরা বলে, স্বামীকে।

কিন্তু আমাকে ডাকল কেন ঐ নামে? আমি কি ওর স্বামী?

হয়তো 'প্রেমিক'কেও ওরা বলে, 'পাওয়া'।

কিন্তু, আমি কি ওর প্রেমিক?

॥ ৪ ॥

সূর্য যখন ক্রমশ উঠে এল মাথার ওপরে, তখন বসল আমাদের খাওয়ার আসর। কিন্তু তার কিছু আগে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, সেটা বলে নিই। আনা টুকিটাকি কাজ করছিল, আর মাঝে মাঝে এসে বসছিল আমার কাছে। পুরুষটিও দু'একবার এসে বসেছিল, আমাকে 'টুহি' বলে ডেকেওছিল কয়েকবার। কিন্তু বেশি কথা বলা ওর বোধ হয় ধাতে নেই, এটা-ওটা-সেটা কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখল সে। লোকটা কাজ-না-ক'রে বোধ হয় থাকতেও পারে না। কাজের মানুষ।

ছেলেটা একসময় কেঁদে উঠল। অবাধ্য শিশু যেমন বায়না ধরে মায়ের কাছে, এও তেমনি। কেউই থামাতে পারছে না, বাপও না, মাও না। আমার তো কথাই নেই, আমি কাছে যাওয়া মাত্রই তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল।

শেষ পর্যন্ত যেভাবে ওরা কান্না থামাল তাও অভূতপূর্ব। মা ছইয়ের ভিতরের ভাণ্ডার থেকে নিয়ে এল মানুষের আস্ত একটা মাথার খুলি, দুটি অন্ধকার অক্ষি-গহ্বর আর সাজানো দাঁতের প্রেতায়িত হাসি। সেই নর-করোটি খেলার সামগ্রী হিসাবে পেয়ে

ছেলেটার কান্না থামল বটে, কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা উঠল যেন ছ্যাঁৎ ক'রে।

ছেলেটাকে খাইয়ে-দাইয়ে খেলা দিয়ে একেবারে হালের কাছে ছইয়ের প্রান্তে বসিয়ে রেখে, মা এল এক ঝুড়ি খাবার আর কিছু জল-ভর্তি বাঁশের চোঙা নিয়ে ছইয়ের অপর প্রান্তে আমাদের কাছে। তিনজনে গোল হ'য়ে বসে শুরু করলাম খাওয়া। কিন্তু, আগুনে ঝল্‌সানো টুকরো টুকরো এ কীসের খণ্ড? কয়েকটা পোড়া মাছ খাওয়ার পর, এই খণ্ডগুলি হাতে আসতেই চমকে উঠলাম। এ যে দেখছি মাংস। ওরা মাংস-খণ্ডগুলি মুখের মধ্যে ফেলে তৃপ্তিভরে খাচ্ছে বটে, কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। কোথায় পেল ওরা মাংস?

ধক্ ক'রে একটা সন্দেহ জেগে উঠল মনের মধ্যে। আর তা জেগে উঠতেই এক ভয়াবহ হিমস্রোত যেন বয়ে গেল শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে সিরসির ক'রে। মনে পড়ল মেননের সেই কথা,—এরা ক্যানিবল্‌স! এরা মানুষ খায়!

অ্যাঁ! তবে কি সত্যিই এরা মানুষ খায়? তবে, এই যা ওরা খাচ্ছে, তা কি কোন নরদেহেরই খণ্ড খণ্ড করা টুকরো? আনা সেই যে গলুয়ের সামনে আমার পাশে বসে রান্না করল, অর্থাৎ আগুনে পোড়াল, সে কি তবে নর-মাংস?

তবে কি 'মেনন?' মেননের মৃতদেহ তুলে এনে খণ্ড খণ্ড ক'রে কোথাও রেখেছে এরা,—আজ আমার প্রিয়বন্ধু মেননের দেহের টুকরোই আমাকে ঝল্‌সে দিয়েছে খেতে!

মুহূর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাংস-খণ্ডটা সমুদ্রে। আমার কাণ্ড দেখে 'হায়-হায়' ক'রে উঠল ওরা। কিন্তু আমার ভ্রূক্ষেপও নেই তাতে। বুক ঠেলে আমার যেন বমি আসছে! তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম নৌকোর একটা ধারে। উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে হাত-দুটো ভালো ক'রে ধুয়ে ফেললাম সমুদ্রের জলে। প্রাণপণে চেষ্টা

করলাম বমি তুলতে। যদিও নিষিদ্ধ কিছু মুখে দেই নি, তবু মনে হ'ল, পেটের যা কিছু, সব আমার উঠে আসবে। ওঃ! সে যে কী অস্বস্তিকর অবস্থা, তা কল্পনাও করতে পারবে না। ইচ্ছা করছিল যা' কিছু ওরা এযাবৎ দিয়েছে, যত কিছু খাওয়া, যত কিছু স্নেহ, —সমস্তই আমার দেহ-মন থেকে বার ক'রে দেই!

লাফ দিয়ে যদি পড়ি সমুদ্রে, তো কেমন হয়? কেমন যেন হ'য়ে গেল মাথাটা,—তীব্র একটা চীৎকার করব? বুক ফাটা চীৎকার? কিংবা, আমার প্রাণবায়ুটা যদি হঠাৎ সেই সময় আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে বেরিয়ে যেত আমার মাথার খুলিটা ভেদ ক'রে, তাহলে বোধ হয় স্বস্তি পেতাম। ওরা খণ্ড খণ্ড করত আমার দেহটা, তারপরে মাথার খুলিটা পরিষ্কার ক'রে রেখে দিত কোথাও। অবাধ্য শিশুটি বায়না ধরলে আমারই সেই খুলিটা দিত তাকে খেলতে, দিয়ে তাকে শান্ত করত—আর, আমি দুটি অন্ধকার রন্ধ্রময় অক্ষি-গোলক ও সাজানো শুভ্র দাঁত নিয়ে নীরব প্রেতায়িত হাসিতে ফেটে পড়তাম!

কী যে হয়েছিল কে জানে, হয়তো সত্যিই ঝাঁপ দিতে গিয়ে-ছিলাম সমুদ্রে, ওরা তাড়াতাড়ি আমাকে দুদিক থেকে এসে ধরে ফেলল দুইজনে। প্রাণান্তকর একটা ঝটাপটি চলতে লাগল কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

প্রাণপণ শক্তিতে আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলাম, মেনন—মেনন?

সমুদ্রের বুকে সারি সারি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঙা ভাঙা ঢেউগুলো জাগছে স্ফটিক-শুভ্র ফেনা মাথায় নিয়ে, সেই ঢেউ একটার ওপরে আরেকটা গিয়ে কোন্ কোণে যেন আছড়ে পড়ে একটা অদ্ভুত করতালির শব্দ ক'রে উঠল শুধু।

শেষে আমিই পরাভব মানলাম।

ওরা আমাকে ধরে এনে শুইয়ে দিল আবার সেইরকম ক'রে ছইয়ের মধ্যে। আমাকে দেখে ছেলেটা কেঁদে উঠতেই নর-করোটি

সমেত ছেলেটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বোধ হয় ওদের বৃহৎ ভাণ্ডারের মধ্যেই অদৃশ্য হ'য়ে গেল আনা।

শরীর-মনের তীব্র উত্তেজনার বেগ একটু প্রশমিত হ'তেই কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল শরীরটা। পুরুষটি অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, কিছুক্ষণ পরে বলল,—টুহি ?

কী যে হ'ল মনের মধ্যে কে জানে, অকস্মাৎ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ বসে রইল আনার 'পাওয়া', তারপরে আস্তে আস্তে আমার মাথায় রাখল তার হাতখানা। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা ধরে ছুঁড়ে দিলাম অন্যদিকে।

সে বুঝি আরও অবাক হ'ল। কেমন যেন বেদনার ছায়া নামল তার মুখে-চোখে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ডেকে উঠল সে, আনা ?

সাড়া দিয়ে ভাণ্ডারের গহ্বর থেকে পরমুহূর্তেই উঠে এল আনা। এসে, আমাদের কাছে বসল দুই উৎসুক চোখের দৃষ্টি মেলে। ওর 'পাওয়া' কী যেন ওকে বলল, তারপরে উঠে চলে গেল সেই ভাণ্ডারের গহ্বরে, শিশুটির কাছে।

আনা আমার মাথার কাছ ঘেঁষে বসে হাসি হাসি মুখে তাকালো, তারপরে সস্নেহে রাখল তার নরম স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ আমার বুকের ওপর। কিন্তু, ওরও হাত আমি সঙ্গে সঙ্গে দিলাম সরিয়ে।—

বিস্মিতই হ'ল বুঝি আনা। আমার মধ্যে ততক্ষণে অদ্ভুত ভীতির একটা স্রোত বইছে। এতক্ষণে বুঝেছি ওদের অভিসন্ধি। আমাকে সারিয়ে-টারিয়ে তুলে শেষ পর্যন্ত সুযোগ বুঝে মেরে ফেলবে। তারপরে, যে হাতে আমাকে ও আদর করছে, সেই হাতে ধরেই আরামে দু'চোখ বুজে চিবোবে আমার হাত-পা আর বুকের হাড়, ওর 'পাওয়া'র মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো বলবে,—কী সুস্বাদু আমাদের টুহির মাংস, দেখেছ ?

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটবার পর আনা আবার তার হাতখানা আমার বুকের ওপর রাখল। আমার বক্ষদেশে তার হাতের মৃদু ছোঁয়া প্রজাপতির পাখার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আবার দু'চোখ আমার ভরে উঠল জলে,—সেইভাবেই ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর হাতখানাই ভাসমান তৃণখণ্ডের মতো প্রাণপণে ধরলাম আঁকড়ে, যেন বলতে চাইলাম,—তুমিও? তুমিও আমাকে প্রাণে মারবে!

কী যেন বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপরে হাসল, ভারী স্নিগ্ধ সেই হাসি। দুটি নরম হাতের আকর্ষণে ধীরে ধীরে তুলে বসাল আমাকে, তারপরে নিজের হাতে চোখের জল দিতে লাগল মুছিয়ে। বার বার বলতে লাগল, টুহি—টুহি?—অর্থাৎ কী তোমার হয়েছে, আমাকে বলো তো টুহি?

নিজেকে অনেকটা সামলে এনেছি ততক্ষণে। সত্যিই তো, অর্থ কী এসব ভাবালুতার? কাদের কাছে প্রকাশ করছি এ চিত্ত-দৌর্বল্য।

ও কিন্তু একসময় হঠাৎ-ই আমার কাছ ঘেঁষে সরে এল, তারপরে অতি আকস্মিক ঘটল সেই ঘটনা, দুটি হাতের বাহুবেষ্টনে আমাকে বেঁধে ফেলল দৃঢ় আলিঙ্গনে। যেন বলতে চাইল, এই আমি তোমাকে ঘিরে রইলাম আমার দেহ দিয়ে, দেখি, কে তোমার কী করে?

আমার সমস্ত শরীর সেই অভাবিত ঘনস্পর্শে উঠেছে শিউরে, রক্তের স্রোতে অকস্মাৎ জেগেছে দোলা,—হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, দুইয়ের কাছেই, আনার 'পাওয়া'র মুখ!

আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলেও আনা ছাড়ল না আমাকে। পুরুষটিও নির্বিকার চিত্তে সহজভাবেই কী যেন প্রশ্ন করল আনাকে, আনাও সহজভাবে দিল উত্তর। 'অয় অয়' বলে

মাথা নাড়ল বারকয়েক, তারপরে সোজা হেঁটে চলে গেল গলুয়ের কাছে। সেখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন দেখতে লাগল সে একমনে।

এ-ও আমার মতো লোকের কাছে বিস্ময় বই কি। নিজের স্ত্রীকে অপরের বাহুলগ্না দেখে যে ঈর্ষান্বিত বোধ করে না, কেমন সে পুরুষ ? সে কি দেবতা, না দানব ? বললাম,—আনা ?

—ই ?

—'পাওয়া' ?—অর্থাৎ, বলতে চাইলাম, কী মনে করল তোমার 'পাওয়া' ?

ও কিন্তু খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, মুখখানা আবার রাঙা হ'য়ে উঠল রক্তোচ্ছ্বাসে, বলল,—পাওয়া ?

তারপরেই আমার বুকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বললে,—পাওয়া। —অর্থাৎ যেন বলতে চায়, তুমি আমার 'পাওয়া' !

হয়তো ব্যাপারটা নিছক কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু সে মুহূর্তে আমার মন হ'য়ে উঠেছিল দুঃসাহসী, ভেবেছিলাম,—আসে আসুক মৃত্যু, খণ্ড খণ্ড করুক আমার দেহটা। কিন্তু তার আগে অধিকার ক'রে যাই এই জলকন্যাকে। পরমুহূর্তেই দু'হাতে আমি জড়িয়ে ধরলাম ওকে, কিন্তু কিছু ঘটবার আগেই গলুয়ের কাছ থেকে হাঁক এল,—আনা।

আনা চীৎকার ক'রে সাড়া দিল,—ই।

হাত নেড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিমায় কী যেন বলতে লাগল পুরুষটি, আর সেই সব কথা শুনে তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গলুয়ের দিকে ছুটে গেল আনা।

অপসৃয়মান আনার দিকে তাকাতে তাকাতে গলুয়ের সামনের আকাশে চোখ পড়তেই প্রচণ্ড আতঙ্কে কেঁপে উঠল আমার মন। সমস্ত আকাশ জুড়ে ভীষণ একটা কালো মেঘ অতিকায় ঐরাবতের মতো দাঁড়িয়ে, আর তারই কোলে সুশুভ্র ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে

কয়েকটি সাগর-পক্ষী। কয়েক মুহূর্ত পরেই ছুটে এল আবার আমার কাছে আনা, আমার কাঁধে নাড়া দিয়ে অন্য হাতে সেই ধূম্রায়মান দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলে উঠল,—টুহি।

আমার নাম দিয়েছিল ওরা 'টুহি'—আবার দিগন্তের দিকে আঙুল দেখিয়েও বলছে,—টুহি। তবে কি 'টুহি' কথাটার অর্থ হচ্ছে,—মেঘ? আমি কি ঝড়ের মেঘের মতো এই দম্পতির মধ্যে এসে পড়েছি বলে আমার নাম দিয়েছে, টুহি?

মেঘের দিকে তাকিয়ে ওকে প্রশ্ন করলাম, 'টুহি'? অর্থাৎ মেঘের নাম বুঝি টুহি?

বুঝতে পারল আমার ইঙ্গিত। মাথা নেড়ে জানাল,—না।

তারপরেই হাতটা মাথার ওপরে উঠিয়ে পাখির ওড়ার চক্রের মতো শূন্যে চক্র এঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল, টুহি মানে পাখী। সাগর-পক্ষী।

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে আমি এসে পড়েছি পাখির মতো।

ওর মুখে-চোখে কিন্তু ঝড়ের মেঘ দেখে কোন ভীতির সঞ্চার ঘটে নি, বরং ঠিক বিপরীতভাবই লক্ষ্য করছি ওর মধ্যে। ওর চোখ-মুখ কেন, সমস্ত অঙ্গই যেন অপার আনন্দে নৃত্য করছে।

নিদারুণ বিস্ময়। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই ঘোর কাটল সে বিস্ময়ের। যা দেখলাম, তাতে আমার মনটাও মুহূর্তে নৃত্য ক'রে উঠল ময়ূরের মতো।

না, মেঘ নয়,—প্রকাণ্ড একটা পাহাড়। অর্থাৎ, মাটি। দ্বীপ। তাই সাগর-পক্ষীর মেলা বসে গেছে চারিদিকে। তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এসে দেখলাম রাশি রাশি সাগর-পক্ষীর দল। কেউ উড়ছে, কেউ ভাসছে হাঁসের মতো সমুদ্রের বুকে। নৌকো যতই এগোতে লাগল দ্বীপের দিকে, ততই শ্যামল হ'য়ে উঠতে লাগল দৃশ্য। প্রকাণ্ড একটা ঐরাবত যেন জলের বুকে কেলি করতে বসেছে, এমনি

মনে হ'ল পাহাড়টাকে। শুধু পায়ের কাছে সোনার মতো ঝকঝক করছে বালির রাশি। আর সেই বালুচরের প্রান্ত ঘেঁষে সোনালী রেখার মতো সাদাসাদা ঢেউ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকো বা ওদের ভাষায় 'জাঙ্কা' গিয়ে লাগল তীরের একপ্রান্তে। ভিতর থেকে লগির মতো একটা বাঁশ নিয়ে এল ঐ পুরুষটি, আর আনা নিয়ে এল, দড়ি। জলের গভীরতা পরীক্ষা করতে করতে এক জায়গায় এসে থামালো নৌকো, তারপর পুরুষটি নেমে গেল জলে সেই দড়ি হাতে ক'রে—ছুটে বালুবেলা পার হ'য়ে একটা নারিকেল গাছের প্রান্তে বেঁধে ফেলল দড়ি। কিছুক্ষণ ধরে চলল অদ্ভুত এক কর্মব্যস্ততা।

'টোম্বি'কে আর আমাকে—দু'জনকেই নৌকোয় রেখে ওরা নেমে গেল তীরে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্নানও বোধ হয় হ'য়ে গেল ওদের। তারপরে সিক্তদেহে করতে লাগল বালুবেলার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি।

আনা আর-একবার এল নৌকোর ওপরে। টোম্বির মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ধরে নাড়া দিয়ে আদর জানিয়ে, এবং আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে, ভাণ্ডার থেকে একটা তীক্ষ্ণ ফলার সড়কি বার ক'রে আনা ছুটে গেল আবার তার 'পাওয়া'র কাছে।

যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখছিলাম, দ্বীপটিতে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই, তীরভূমি জুড়ে নানান রকমের বনস্পতি মাথা হেলিয়ে হাওয়ায়-হাওয়ায় দোলাচ্ছে তার ডালপালা, আর রয়েছে প্রচুর নারিকেল গাছ। অজস্র নারিকেল ফলে আছে সেই সব গাছে। আমাদের দেশের মতো নয়, রীতিমত বৃহৎ আকারের নারিকেল সেগুলো।

কিছুক্ষণ পরে আবার এল দু'জনে নৌকোর ওপরে। এবারে তীরে নামবার বায়না ধরল টোম্বি। তার হয়েছে অদ্ভুত অবস্থা, সে

আমার কাছেও আসতে পারছে না, নৌকোতে একা থাকতেও পারছে না। তাকে কোনরকমে শান্ত ক'রে দড়ি-দড়া নিয়ে আবার দু'জনে ছুটে গেল তীরভূমির দিকে। আনা আমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল, তুমি যেন টোম্বির মতো তীরে নামবার বায়না ধ'রো না।

দূর থেকে দেখতে লাগলাম, তারা বেলাভূমি পেরিয়ে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ ধরে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা! ঢেউগুলো ছলছল ক'রে তীর ছুঁয়ে যাচ্ছে শুধু! আমি মুখ ফিরিয়ে টোম্বির দিকে তাকালাম। টোম্বিও তখন ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই সে কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল মুখ, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও সরে দাঁড়াল।

দ্বীপের দিক থেকে ততক্ষণে কীসের একটা শব্দ আসছে ভেসে। অনেকগুলি পাখির কলরব, আর মাঝে মাঝে এক-একটির তার-স্বরে চীৎকার।

কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। আনা জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে, তার হাতে ঝুলানো বেশ কয়েকটা মৃত বন-মোরগ।

প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই সে এসে উঠল নৌকোয়, এসে তার ভাণ্ডারে বন-মোরগগুলিকে জমা রেখে জলশূন্য বাঁশের চোঙাগুলি নিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়ল। সেই রকম আবার লাফিয়ে লাফিয়ে ঢেউ কেটে কেটে যাওয়া! তীরভূমিতে পৌঁছে ছুটতে ছুটতে ঢুকল সে জঙ্গলে, এবং কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল। এইভাবে দুটো ক্ষেপেই তার শূন্য চোঙাগুলি পুনর্বার ভ'রে গেল মিষ্টি জলে।

জল নিয়ে আসার পর আনা আর তীরে নামল না, মৃত বন-মোরগের স্তূপটা টেনে এনে চলে এল গলুইয়ের কাছে, হাতে তার চকচকে দায়ের মতো একটা-কিছু। ক্ষিপ্র হাতে সে পালক-টালকগুলো ছাড়াতে লাগল।

ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়াল টোম্বি, আমার দিকে একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারপর মায়ের কাছে বসে সাহায্য করতে লাগল মাকে।

আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছিলাম আনার সুনিপুণ ক্ষিপ্র হস্তচালনা দেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মোরগগুলির পালক ছাড়িয়ে, পালক-টালকগুলো সমুদ্রে ফেলে দিয়ে, প্রকাণ্ড নারকেলের খোলে সমুদ্রের জল ধরে নিয়ে এসে তাতে খণ্ড খণ্ড ক'রে মাংসগুলি কেটে কেটে ফেলে দিতে লাগল।

ওর খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটা মোরগের মাংসের দিকে তাকিয়ে ধক্ ক'রে মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠল—তাহলে, সেই যে আমাকে মাংস খেতে দিয়েছিল ওরা, আর আমি খেতে পারি নি, সে কী ছিল তবে এইসব বন-মোরগের মাংস? কে জানে!

মাংস কাটার কাজ শেষ ক'রে নৌকো থেকে রক্তের দাগ সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে ফেলে যখন উঠে দাঁড়াল আনা, তখন আমরা দু'জনে একযোগেই তাকিয়ে দেখলাম, তার 'পাওয়া' একটা নারকেলের গাছের ওপরে উঠেছে দড়ি-দড়ার সাহায্য নিয়ে। তা' দেখে উল্লাসে প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল আনা।

কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা কলরব জাগল দ্বীপের জঙ্গলের দিক থেকে। সেই শব্দ শুনে আনারও গেল মুখ শুকিয়ে, আর, দড়ি-দড়া ফেলে দিয়ে তর্‌তর্ ক'রে নারিকেল গাছ বেয়ে নেমে আসতে লাগল 'পাওয়া'।

নারকেল গাছ থেকে নেমে প্রাণপণে সে ছুটে আসতে লাগল নৌকোর দিকে। সব কিছু লক্ষ্য ক'রে আনা আমাকে ইঙ্গিতে বললে তাড়াতাড়ি লগিটা হাতে তুলে নিতে। আর, সে নিজে হাতের দা-টা নিয়ে গলুইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ছুটতে ছুটতে জলে এসে পড়েছে 'পাওয়া,' কিন্তু তাতেই রক্ষে নেই। হঠাৎ জঙ্গলের এক বনস্পতির আড়াল থেকে একটা তীর

এসে অকস্মাৎ বিঁধে গেল তার পিঠে,—আর পরক্ষণেই প্রায় দশ-বারোজন লোক, এরাও প্রায় নিরাবরণ, হৈ হৈ করতে করতে তীরভূমিতে নেমে পড়ল।

তীর-বিদ্ধ অবস্থাতেই 'পাওয়া' চেঁচিয়ে কী-যেন বলল আনাকে, আর নিজে কষ্টে-সৃষ্টে কোনক্রমে এসে নৌকোয় উঠে পড়ল। লোকগুলি নৌকো লক্ষ্য ক'রে তীর চালাতে লাগল। কয়েকজন অত্যুৎসাহী ব্যক্তি ততক্ষণে একেবারে জলেই নেমে পড়েছে।

'পাওয়া' এসে ইতিমধ্যে পাটাতনের ওপরে শুয়ে পড়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। চেঁচিয়ে কী যেন বললে সে আনাকে। আনা 'অয় অয়' বলে আমাকে বললে,—তাড়াতাড়ি লগিটা দিয়ে নৌকোটা ঠেলে দিতে জলের দিকে।

আমি তা' করার আগেই আনা দা দিয়ে নৌকোর দড়িটা কেটে দিল। আমার লগি-ঠেলা আর ওর দড়ি-কাটার কাজটা হ'য়ে গেল প্রায় একই সঙ্গে। ফলস্বরূপ, নৌকোটা হঠাৎ-ই একটু টাল খেয়ে সবেগে জলে এসে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আনা ছুটে গেল হালের দিকে। হালটাকে ঘুরিয়ে-টুরিয়ে কীভাবে যেন বেঁধে রেখে এসে ছুটে এল আমার কাছে, গলুইয়ে। লোকগুলি তখনও নৌকোর দিকে আসবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। তাদের বিচিত্র ও বীভৎস চীৎকারে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল মুহূর্তে। আনা আমার হাত থেকে নিজেই লগিটা নিয়ে সজোরে নৌকাটাকে ঠেলে দিতে লাগল সমুদ্রের দিকে।

সে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা। ওদিকে 'পাওয়া' যাচ্ছে রক্তে ভেসে,—তার কাছে আমাদের যাওয়া উচিত, না, ঐ-যে হৈ-হৈ ক'রে ওরা আসতে চেষ্টা করছে, আর ছুঁড়ছে তীর,—ওদের কাছ থেকে নৌকোটাকে বাঁচানো উচিত আগে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকোটা অবশ্য সমুদ্রের অনেকটা ভিতরে

চলে এল। কিন্তু আমার ভয় করছিল, দ্বীপের লোকেরা না নৌকো নিয়ে আমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে!

না, সেটা আর হ'ল না। লগিটা তুলে যথাস্থানে রাখবার পর আমরা দু'জনেই একযোগে তাড়াতাড়ি গেলাম 'পাওয়া'র কাছে। টৌম্বি তার বাপের পিঠের তীর ধরে টানাটানি করছে, আর মুখ বিকৃত ক'রে তীব্র আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করছে 'পাওয়া'।

রক্তে রক্তে ততক্ষণে ভেসে গেছে জায়গাটা। ওরকম ভীষণ রক্তপাত দেখে অপরের পক্ষে মূর্ছা যাবার সম্ভাবনাই বেশি। আনার ভাবান্তর ঠিক লক্ষ্য করা গেল না, সে ছুটে তার ভাণ্ডার থেকে সেইরকম ঘাসের চাপড়া নিয়ে এল কিছু। আমার হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে জানাল দু'হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি রগড়ে দিতে। আর, সে নিজে সজোরে তীরটা টান দিয়ে খুলে ফেলল পাওয়ার পিঠ থেকে। তীরটা ছুঁড়ে ফেলল সে পাটাতনের ওপরে, আর এদিকে গলগল ক'রে বেরোতে লাগল আরও রক্ত 'পাওয়া'র পিঠের ক্ষতস্থানটি থেকে।

ঘাসের চাপড়া আমার হাত থেকে নিয়ে পাওয়ার পিঠের ওপর চাপ চাপ ক'রে বসাতে লাগল আনা। আর আশ্চর্য, বার কয়েক এইরকম করার সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত গেল বন্ধ হ'য়ে।

ভাণ্ডার থেকে আবার সে ছুটে গিয়ে নিয়ে এল নারকেল-ছোবড়া-থেঁতলানো নরম একটা জিনিস, সেটা দিয়ে ঘষে ঘষে রক্তের দাগ সে তুলে ফেলল পাওয়ার গা থেকে। তারপরে আমাকে ইঙ্গিতে জানাল, ধরো, একে ছইয়ের ভিতরে নিয়ে যাই।

ধরাধরি ক'রে দু'জনে নিয়ে গেলাম 'পাওয়া'কে ছইয়ের মধ্যে। আমাকে ওর পাশে বসিয়ে রেখে আনা আবার এল নৌকোর পাটাতনের ওপরে। সমুদ্রের জল নিয়ে সেই জলে রক্তের দাগ মুছে মুছে তুলে ফেলতে লাগল।

পাওয়া কিন্তু দাঁতে দাঁত টিপে সব কিছু সহ্য করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল আনা, বসল পাওয়ার মাথাটা কোলে নিয়ে। আমাকে ইঙ্গিতে দ্বীপের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে ভঙ্গিভরে বোঝাতে লাগল, ওরা মানুষ খায়। নিজেকে দেখিয়ে দা দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটার ভঙ্গি ক'রে শেষে তা মুখে তোলার মূকাভিনয় করল আনা।

'পাওয়া' এভাবে শোচনীয় আঘাত পাওয়ায় সত্যিই দুঃখিত হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হ'ল, এরা যখন অপরকে 'মানুষ খায়' বলে ইঙ্গিত করছে, তখন এরা নিজেরা তা' করে না। চিন্তাটা আসামাত্রই বুক থেকে একটা পাষাণ-ভার নেমে গেল।

বহুদিনের কথাই তোমাকে বলছি, কিন্তু বলতে বলতে মনে হচ্ছে, যেন এই সেদিনের কথা। যেন ঘটনার সমাপ্তি এখনো ঘটে নি, এখনও তার রেশ চলছে।

কোথায়, কোন্ দ্রাঘিমাংশে, বঙ্গোপসাগরের কোন্ প্রান্তে, তা আমি আজও ঠিক হিসাব ক'রে বলতে পারব না, সে এক অদ্ভুত জ্যোৎস্না-ঝিকিমিকি রাত্রে, আকাশ থেকে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র খসে গেল। জানি না আনা কতটা বুঝেছিল, কিন্তু সে যে শেষ পর্যন্ত চলেই যাবে, আমি অন্তত সেই চরম মুহূর্তটি আসবার আগে পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারি নি।

হ্যাঁ, ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে বাড়তে বিকেল হ'য়ে গেল, সমুদ্রও কী এক অভাবনীয় সমাপ্তির আভাসে সেদিন শান্ত, সমাহিত— ঝিরঝিরে এক ম্লান হাওয়া বইছে শুধু।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বমুহূর্তে 'পাওয়া' কী যেন ডেকে বলল আনাকে। আনা চলে গেল তার ভাণ্ডারের মধ্যে। নিয়ে এল ছোট্ট একটা পাল। ছোট্ট মাস্তুলটিতে সেটা খাটিয়ে দেওয়া মাত্র নৌকোটা

পেলো আরও তীব্র গতি। তরতর ক'রে হাঁসের মতো ঢেউগুলি পার হ'য়ে যেতে লাগল নৌকোটা।

আমি তখন বাইরেই এসে বসেছিলাম। টৌম্বি ঘুমিয়ে পড়েছিল, 'পাওয়া'ও তন্দ্রাভিভূত হ'য়ে পড়েছিল, দেখে এসেছিলাম। অনেক কথাই ভিড় ক'রে আসছিল একসঙ্গে। এতদিন 'পাল' দেখি নি। আজ 'পাল' খাটালো কেন ওরা? হয়তো সমুদ্রের স্রোত অনুকূল নয়,—অথচ যেতে হবে ওদের স্রোতের প্রতিকূলে। এতদিন যথেচ্ছ বেড়িয়ে এবার বোধহয় ফেরার মন হয়েছে ওদের দেশের দিকে। ওদের দেশ? হ্যাঁ, মাগু'ই দ্বীপপুঞ্জ। জলে জলে ঘুরলেও স্থলও তো প্রয়োজন। নৌকো তৈরি করবে কোথায়? জিনিসপত্র প্রস্তুত এবং সংগ্রহ করবেই বা ওরা কোথা থেকে? প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে নৌকো বেঁধেই বা রাখবে কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা চিন্তা আসছিল। 'পাল'টা কীসের তৈরি? কাপড়ের? কাপড়ই যদি হয় তো, এরা তুলোর ব্যবহার জানে। আর জানেই যদি, তো নিরাবরণ থাকে কেন?

এইসব নানারকম চিন্তায় মনটা অস্থির, হঠাৎ কী একটা স্পর্শে চমকে উঠলাম,—মুখ ফিরিয়ে দেখলাম,—আনা। আনা ইশারায় জানাল, ভিতরে এসো। তোমাকে ডাকছে।

গেলাম। ওর শিয়রের কাছে বসে ওর মুখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম, 'পাওয়া' আমাকেই খুঁজছিল। বুকটা, ঘন ঘন উঠছে আর নামছে, নিশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে ওর। আস্তে আস্তে বাঁ-হাতটা তুলে ধরল। সেই জ্যোৎস্নালোকিত আবছা আলোয় তাকিয়ে দেখি, একটা আঙুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে! আতঙ্কিত হ'য়ে বলে উঠলাম,—একী!

আমার মুখের ভাষা না বুঝলেও ভাবটা বুঝল। আনা একটা দায়ের মতো চকচকে জিনিস আমার সামনে তুলে ধরল, ইঙ্গিতে বোঝাল 'পাওয়া' নিজেই নিজের আঙুলে দা দিয়ে রক্ত বার করেছে।

পরমুহূর্তেই 'পাওয়া' করল কী, তার ডান হাতের তর্জনী সেই রক্তে মাখিয়ে আনার কপালে ফোঁটা এঁকে দিল, তারপরে, পর পর আমার কপালে, টোম্বির কপালে।

এ অনুষ্ঠানের মর্ম সেদিন যদি বুঝতাম তো, আমার ইতিহাসই অন্যরূপ ধারণ করত। কিন্তু, কিছুই আমি বুঝি নি। শুধু আনার দিকে চেয়ে দেখেছিলাম, নীরব অশ্রুতে চোখ তার ভরে উঠেছে।

এই ব্যাপারের কিছু পরেই 'পাওয়া' চোখ বুজল। হ্যাঁ, চিরতরেই চোখ বুজল। আনা তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগল, কাঁদতে লাগল টোম্বিও,—আমি শুধু নীরবে ছইয়ের বাইরে এলাম। আকাশের বিপুল নক্ষত্রমালার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, অনন্ত আকাশের পূজামণ্ডপের অগণিত প্রদীপ থেকে একটি প্রদীপশিখা বুঝি নিভে গেল!

যার ওপর আমরা হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, সেই অসভ্য মানুষটি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, প্রতিশোধ নেয় নি, প্রতিঘাত করে নি, স্নেহ আর মমতায় অভিভূত ক'রে দিয়েছে শুধু।

রাত কেটে গেল। সূর্য উঠল আমাদের পিছনের দিগন্ত থেকে। অর্থাৎ, পশ্চিম দিকে চলেছি আমরা। মেঘ আর কুয়াশায় ছেয়ে ছিল সমস্ত পশ্চিম দিকটা। তারই মধ্য থেকে একসময় উষাকাল পার ক'রে দিয়ে উদিত হলেন জবাকুসুমের মতো গাঢ় রক্তবর্ণ সবিতৃদেব! যেমন চলে গেল, চলে গেল 'পাওয়া'; ওদের বুকের রক্তে যেন দিগদিগন্ত আবীরের মতো লাল হ'য়ে গেছে,—ওদেরই বুকের রক্তের আভায় যেন ছলছল ক'রে কাঁপছে আরক্তিম ঢেউয়ের দল! দেখতে দেখতে কেমন যেন ক'রে উঠল বুকের ভিতরটা, তাড়াতাড়ি

উঠে পড়লাম। ছইয়ের ভিতরে গিয়ে দেখি, তেমনি পড়ে আছে 'পাওয়া', মুখের ভাব অতি প্রশান্ত, যেন এখনও ঘুমুচ্ছে।

ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে এবারে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। রক্তক্ষরণে 'পাওয়া'র মৃত্যু হয় নি; মৃত্যু হয়েছে তীব্র বিষে। ঐ যে তীর ছুঁড়েছিল অজ্ঞাত দ্বীপের লোকেরা, তাদের তীরের ফলা নিশ্চয়ই ছিল বিষ-মাখানো। আনাকে পরে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তেমনি ইশারায় হাবে-ভাবে বলেছিল আনা, তীর লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝেছিল, 'পাওয়া' আর বাঁচবে না। ওদের তীর লাগলে মানুষ বাঁচেও না।

সূর্য যখন মধ্যগগনে, 'পাওয়া'র শেষকৃত্য করা হ'ল তখন। তার ভাণ্ডার থেকে বন-মোরগের মাংস কয়েক টুকরো নিয়ে এল আনা, সেগুলিকে একটা বাঁশের চোঙায় ক'রে 'পাওয়া'র কোমরে একটা শুকনো লতাতন্তু দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তারপরে যন্ত্রচালিতের মতো দু'জনে দু'দিকে ধরে ওকে ফেলে দিলাম সমুদ্রে। কয়েকটি আবর্ত, সাদা ফেনায়িত ঢেউ, তারপরেই আর কিছু নয়। একটা বুদ্বুদ উঠল, আবার মিলিয়ে গেল।

পার হ'য়ে গেল সেই দিন সেই রাত। পরে, আবার দিন আবার রাত। তাও কাটল। আবার হ'ল ভোর, আবার সূর্য উঠল পূর্বদিগন্তে, আমাদের পিছনে। ক্রমে ক্রমে প্রখর হ'ল সূর্যরশ্মি, আবার এক সময় হ'য়ে গেল স্তিমিত। এল সন্ধ্যা। সন্ধ্যা পেরিয়ে এল রাত্রি। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নক্ষত্রের সভা বসল, চাঁদ তখনও ওঠে নি।

আশ্চর্য কয়েকটা দিন। কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলি নি আমরা। মাঝে ঘুমের ঘোরে টোম্বি কেঁদে উঠেছিল দু'রাত্তিরে, এছাড়া কোন রব জাগে নি নৌকার মধ্যে। আগুনও জ্বলে নি।

পুরানো মাছের টুকরো চুবড়িসুদ্ধ হাতের কাছে কে যেন রেখে গেছে যন্ত্রের মতো। যন্ত্রের মতো আমিও কয়েকটা তুলে নিয়েছি মাত্র, কোন কথা বলি নি।

ছইয়ের মধ্যে রাত্রে আর প্রবেশ করি নি। ছইয়ের বাইরে 'পাওয়া' যেখানে শুয়ে থাকত, সেখানেই কাটিয়ে দিতাম সমস্তটা রাত। শুধু দিনে, রৌদ্রের উত্তাপ যখন বাড়ত, গিয়ে বসতাম ছইয়ে মধ্যে একটা ধার ঘেঁষে। আমাকে দেখে টোম্বি তার মার কাছে গিয়ে উঠে বসত জড়োসড়ো হ'য়ে। কথা হয়তো আমিই শুরু করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা হ'ত না। আমার জামাটা নেই তা আমি জানি, জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, তার পকেটের কাগজপত্র-গুলো কী হ'ল ? ছোট্ট মানিব্যাগটা ?

আনার নিষ্প্রাণ নিথর মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হ'ত, নিরর্থক হবে সেই প্রশ্ন। আর, ফিরে পেয়েই বা কী লাভ হবে আমার ? নাই বা রইল সেই কয়েকটা নোট, নাই-বা রইল আমার 'আই-ডেনটিটি কার্ড'! এই দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের বুকে, কিংবা এই বিচিত্র নারীর মনে, কী-ই বা মূল্য আমার সেই পরিচিতির ?

এক-এক সময় অসহ্য লাগত! সমুদ্রই বা এতদিন ধরে শান্ত হ'য়ে আছে কেন! তার থেকে রুদ্রমূর্তি ধরুক সমুদ্র, ভাসিয়ে নিয়ে যাক আমাকে প্রচণ্ড এক তরঙ্গের আঘাতে। টোম্বি আর আনা থাকুক নিশ্চিন্তে—নির্ভয়ে। ফিরে যাক ওদের সেই অজ্ঞাত—নিভৃত দ্বীপে !—সেখান থেকে পুনর্বার সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসুক 'পাওয়া'র মতো কোন পুরুষকে। আবার ওদের যাত্রা শুরু হোক নতুন কোন দিগন্তের দিকে।

জানি না ওদের রীতিনীতি, তবে নিরাবরণ আদিবাসী যখন, তখন বিধবা-বিবাহটা অন্তত ওদের সমাজে সহজ, এটা অনুমান করা কঠিন নয়।

ফসফরাস জ্বলে জ্বলে উঠছে ঢেউয়ের মাথায়। একটা উজ্জ্বল

সবুজ-সবুজ আভায় ভ'রে যাচ্ছে সেই মুহূর্তটা। তারই আভায় দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আমারই সামনে বসে আছে—আনা। লম্বা আর ঘন মাথার চুল হাওয়ায় উড়ছে, আর স্তব্ধ হ'য়ে সটান ভঙ্গিমায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে। নিপুণ শিল্পীর হাতে-আঁকা গ্রীক ভাস্কর্য যেন কোন!

অবাক হ'য়েই বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম সেই নীরব, নিথর মূর্তিটির দিকে। কলকল-ছলছল একটা শব্দের উচ্ছ্বাস তুলে ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হ'য়ে চলেছে নৌকোটা, ছোট্ট পালটা ফুলে আছে পাখা-ঝাপটানো রাজহংসের মতো। আর, আকাশে তখন লঘু মেঘগুচ্ছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে রূপালী ধনুকের মতো বাঁকানো চাঁদ।

সেই চাঁদেরই অস্ফুট আর স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে ওর চুলে, কপালে, গালে, বুকে আর মসৃণ দেহে। হুহু হাওয়ায় উড়ছে ওর ঘন কেশগুচ্ছ, চাপা-জ্যোৎস্নার মোহময় জ্যোতি যেন স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছে সেই কেশ-অরণ্যের মধ্যে! চক্ষের পল্লবে, নাসাগ্র-ভাগে আর চিবুকে যেন উজ্জ্বল শিখার মতোই জ্বলছে সেই অদ্ভুত জ্যোৎস্না,—আর, সুমসৃণ দেহবল্লরীতে গিয়ে ঠিকরে পড়েছে।

দেখে দেখে চোখের পলক আর পড়তে চায় না। ধীরে ধীরে মোহমুগ্ধের মতো কাছে গিয়ে বসলাম ওর,—মৃদু কণ্ঠে, আস্তে, ডাকলাম,—আনা?

—ই?

—পাওয়া?

অর্থাৎ প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম,—'পাওয়া'র জন্য মন কেমন করছে, না?

চকিতে ও মুখ ফেরালো আমার দিকে, তারপর হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল আমার কণ্ঠদেশ, অদ্ভুত এক নেশাগ্রস্তের কণ্ঠস্বরেই বলে উঠল,—পাওয়া।

যেন বলতে চাইল,—আমার 'পাওয়া' অর্থাৎ স্বামী এখানে আর কে ? তুমি।

ব'লেই আমার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে পরক্ষণেই ছেড়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। সাগ্রহে দুইহাতে টেনে নিলাম ওর মুখখানা। বিহ্বল মনে সেই মুখের ওপরে মুদ্রিত ক'রে দিলাম মধু মুহূর্তের চিহ্নটুকু !

ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বিস্ফারিত ওর দুটি চোখ, বিস্মিত ওর ভঙ্গী ! ডাকলাম,—আনা ?

কাছে এল না। ভয়ার্ত একটা প্রাণীর মতো দূর থেকেই তাকিয়ে রইল আমার দিকে। হরিণীর মরণোন্মুখ ভয়ার্ত দৃষ্টি যেন শিকারীর ওপরে ন্যস্ত।

পার হ'য়ে গেল রাত্রি। সকালে কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হ'ল আমাকে। প্রথমেই ও হালের কাছে গিয়ে জলের গতি নিরীক্ষণ করল কিছুক্ষণ ধরে। কি লক্ষ্য ক'রে মুহূর্তে কেমন যেন কালো ছায়ায় ঢেকে গেল ওর মুখ। হালটাকে আবার নতুন ক'রে ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন ক'রে বাঁধল। তারপরে এল পালটার কাছে,—পালটা টেনে গুটাল না, কিন্তু মুখটা সরিয়ে দিল। শুরু হ'ল পরবর্তী অধ্যায়,—দৈনন্দিন গৃহস্থালী।

আমি পালটার আড়ালে গিয়ে বসেছিলাম চুপচাপ। পালটা কিন্তু ঠিক কাপড়ে তৈরি নয়। যেমন চাটাই বোনে হাতে, তেমনি বোনা কোন নরম গাছ-গাছালির আঁশ দিয়ে।

কতক্ষণ নিঝুম হ'য়ে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ পিছন থেকে আনা এসে স্পর্শ করল আমার কাঁধ। ওর মুখের দিকে তাকালাম জিজ্ঞাসুনেত্রে। দেখলাম, কী এক আতঙ্কে মুখখানা ওর বিবর্ণ। ইশারায় বললে,—ভিতরে চলো।

যন্ত্রচালিতের মতোই ওর পিছনে পিছনে গেলাম ছইয়ের মধ্যে। সেই মড়ার মাথার খুলিটা নিয়ে খেলছিল টোম্বি, আমাকে দেখে একপাশে সরে গিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে বসল সে! আর হাতের কাছে হারপুনের মতো অস্ত্রটা রেখে আমার কাছে ঘেঁষে বসে পড়ল আনা। বললে,—রীলা।

—রীলা!

ইশারায় হাত-পা নেড়ে যা জানাল তাতে মনে হ'ল, কোন অতিকায় রাক্ষুসে মাছের কথা বলছে, তিমিও হতে পারে, হাঙরও হ'তে পারে। হাঙর হওয়াই সম্ভব! নৌকোটাকে হাঙর তাড়া ক'রেছে।

ব্যাপারটা বুঝেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, ও হাত ধরে টান দিল, ইশারায় জানাল, যেও না। যদি তেমন কিছু হয়, তো, সামনে হাতের কাছে হারপুন রইল ছুঁড়ে মেরে ফেলব জন্তুটাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমি কিন্তু হাঙরের কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। তাকিয়ে দেখি, একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। চোখ দুটি জলে ভরা।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার?—ইশারায় জানালাম,—কাঁদছ কেন!

ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল আনা। তারপরে যা আমাকে বোঝাল, তাতে যুগপৎ বিস্ময় আর কৌতুকের সীমা পরিসীমা রইল না।

কাল রাত্রে সেই যে ওর মুখখানা মুখের কাছে এনে ছুঁয়ে দিয়েছিলাম, তাতে ও রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। ওসব করলে নাকি মানুষ মরে যায়। এই যে হাঙর এসে ঘুরছে নৌকোর চার ধারে, যদি আনাকে, কিংবা, আমাদের কাউকে টেনে জলের ভিতরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে!

এতক্ষণে বুঝলাম, ওই রীতিটাই ওদের কাছে অপ্রচলিত। সেই যে প্রথমে অসুস্থ অবস্থায় ওর হাত টেনে মুখে ছুঁইয়েছিলাম, তাতে ও যেমন বিস্মিত হয়েছিল, তেমনি নতুন একটা স্বাদে বিহ্বলও হ'য়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, হাঙর কিন্তু আমি আর দেখতে পেলাম না। হয় আনা দেখতে ভুল করেছিল, নয় তো হাঙর এসে থাকলেও শেষ পর্যন্ত চলে গেছে।

আবার গিয়ে বসলাম সেই পালটার আড়ালে। সেই একঘেয়ে জল আর জল,—আর একটুও ভালো লাগছে না। একবিন্দু মাটিও কি চোখে পড়ে না দূর থেকে? কোন বনস্পতির সবুজ ডাল-পালার বিস্তার?

একবার টহলদারী বিমানের শব্দ পেয়েছিলাম এরই মধ্যে একদিন, মেঘের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সভ্যজগতের আর কোন পরিচিতি চোখের সামনে পড়ছে না। 'জাপুরা' যে এই আদি-বাসীদের ওপর কোন অত্যাচার করবে না তা জানি, কিন্তু তাদের কোন লঞ্চ বা জাহাজও তো সমুদ্রে টহল দিয়ে ফিরবে? কোথায় তারা?

বসে বসে কী আর করব, এদের নৌকোটাই দেখছিলাম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে। হাল্কা কোন কাঠ আর বেত দিয়ে তৈরি। গঠনের দিক দিয়েও বিশেষত্ব আছে। কিন্তু, কোথায় যাচ্ছি আমরা? কাঠের চোঙায় রাখা খাবার জলও যে ফুরিয়ে আসছে, তা' আমি জানি। খণ্ড খণ্ড-করা বন-মোরগের মাংস আগুনে ঝল্‌সে আর শুকনো মাছ পুড়িয়ে আরও কিছুদিন না হয় চলল, কিন্তু তারপর?

আবার এল সন্ধ্যা, আবার রাত। পালটা গুটিয়ে ফেলল আনা, বুঝলাম, আবার অনুকূল স্রোত পেয়ে গেছি আমরা। হাতের টুকিটাকি কাজ:সেরে, টোম্বিকে ঘুম পাড়িয়ে আনা বোধ হয় ছইয়ের মধ্যেই শুয়েছিল। আমি যথারীতি শুয়েছিলাম বাইরে।

মধ্য রাত্রে হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম। দেখি, চাঁদ উঠে গেছে, চাপা একটা জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারিদিক, আনা চুপি চুপি কখন এসে বসেছে কাছে।

—আনা!

আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, চোখতুটি দেখতে দেখতে জলে ভরে এল, ঠোঁটতুটিও বুঝি কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে, অস্ফুটস্বরে কী যে বললে, বুঝতে পারলাম না।

ইশারায় প্রশ্ন করলাম, কী বলছ?

তেমনি জলভরা তুটি চোখের দৃষ্টি, হাত আর মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে যা জানাতে চাইল, তাতে বুঝলাম, ও বলছে,—তুমিও মরে যাবে।

—মরে যাব! বিস্ময়ান্বিত হ'য়ে প্রশ্ন করলাম,—কেন!

বোঝাল, আমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর লোভ সামলাতে পারে নি আনা,—আমি যেমনটি করেছিলাম, তেমনি ক'রে ও-ও আমার মুখের ওপর রেখেছিল মুখ। এরকম করতে নেই। এরকম যাকে করা যায়, সে নাকি আর বাঁচে না, মরে যায়!

হেসে উঠলাম ওর কথা শুনে। বললাম, মিথ্যে কথা। ওতে কিছু হয় না।

বলেই তু'হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিলাম কাছে।

মত্ততার ঝড় থেমে গেলে নীরবে কাঁদতে লাগল আমার কাঁধে মাথা রেখে। কী অদ্ভুত ওদের সংস্কার। বললে,—আমি ঠিক মরে যাব। তুমি টৌম্বিকে দেখো।

এর পর কয়েকটা দিন। আমার সান্নিধ্যলাভের তৃষ্ণা ওর মধ্যে যে কী প্রবল হ'য়ে উঠল, তা বলে বোঝাতে পারব না। এটুকু বুঝেছিলাম,—মুখে মুখ রেখে আদর করার সুসভ্য রীতি ওদের মধ্যে

নেই,—এটা ওর কাছে অনাস্বাদিতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু, সংস্কারের টান একদিকে, অন্যদিকে 'নিষিদ্ধ' বিষয়ের আকর্ষণ,—এই দুই প্রবল প্রতিকূল স্রোতের আবর্তে পড়ে ক্রমাগত বিপর্যস্ত হ'তে লাগল আনা।

একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে ভালোই হয়েছিল,—এই নতুন নেশায় মত্ত না হলে কেমন ক'রে ও ভুলে থাকতে পারত টৌম্বির বাবা 'পাওয়া'কে

সে একটা দিন,—বিকেলবেলা। পালটা তুলে দিয়েছি, প্রসারিত পক্ষ একাকী হংসের মতো তরতর ক'রে বয়ে চলেছে আমাদের নৌকো, দিগন্তে হাল্‌কা সাদা মেঘ জমে আছে থরে থরে—তার ওপরে লালরঙের সামান্য একটু আভাস, আর চারিদিকে ঢেউ আর ঢেউ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে যেন খেলা করতে করতে। এক ঝাঁক রূপোলী মাছ হঠাৎ-ই উড়ুক্কু মাছের মতো লাফ দিয়ে জলের ওপরে উঠে পরক্ষণেই আবার ডুব দিল জলে। বৃষ্টির ধারা জলে পড়লে যেমন ফোঁটা ফোঁটা অসংখ্য বুদ্‌বুদ, জেগে ওঠে, তেমনি সৃষ্ট হ'ল প্রচুর বুদ্‌বুদ, কিন্তু পরক্ষণেই তার ওপর ভেঙে পড়ল একটা ঢেউ, যেন মুহূর্তে মুছে দিয়ে গেল সমস্ত চিহ্নগুলি!

বসে বসে এইসব দেখছি, ওর হাতের টুকিটাকি কাজ সেরে আনা বসল এসে আমার কাছে ঘেঁষে। জিজ্ঞাসা করলাম,—টৌম্বি?

আঙুল দিয়ে ছইয়ের দিকটা নির্দেশ করাতে বুঝলাম—টৌম্বি ছইয়ের ভিতরে আছে।

আনা আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে খেলা করতে লাগল, গুনগুন ক'রে কী এক অদ্ভুত সুরের গানও গেয়ে উঠল! বুঝলাম মনটা ওর খুশীতে ভরে আছে।

এইরকম খুশীই দেখছি ওকে ক'দিন ধরে। প্রতিটি মুহূর্তেই ওর চাই আমাকে। আমাকে চোখের আড়ালটুকুও যেন ও

করতে পারে না! ও আমার সম্পূর্ণ আপন হ'য়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই যে আপন হ'ল না, সে টোম্বি। তার কাছে গেলে সে আর তেমন ক'রে ভয়ে কেঁদে-ককিয়ে ওঠে না বটে, কিন্তু, সে যখন আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন মনে হয়, পাথরের মতো নিষ্প্রাণ সে দৃষ্টি, যেন চাবুকের কশা হানতে থাকে আমাকে!

আনা আমার পায়ের কাছে প্যাণ্টের কিনারটা ধরে দেখতে থাকে, তারপরে ইঙ্গিতে বলতে চায়—ওটা টান মেরে ফেলে দাও। অর্থাৎ 'আমাদের মতো হ'য়ে যাও!'

ওর কথার উত্তর না দিয়ে চট্ ক'রে উঠে দাঁড়াই। পালটার কাছে গিয়ে, ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে ইঙ্গিতে ওকে জানাই, এটা এখন নামিয়ে ফেললে হয় না?

মুখে অস্ফুট একটা আর্তস্বর তুলে তাড়াতাড়ি ওঠে পড়ে ও, তারপরে আমার কাছে এসে হাত আর মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে আমাকে পালটা নামাতে বারণ ক'রে ছুটে যায় গলুইয়ের কাছে। সরু গলুইয়ের মুখটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গলুইয়ের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে, নিচে, জলের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ,—তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায় আমার দিকে, হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বলে,—পালটা নামিয়ে নিতে পারো।

আমি পালের দড়িতে হাত দিই। ছোট্ট পাল। নামিয়ে, পালের কাপড়টা মাস্তুল থেকে খুলে নিতে আমার একটুও দেরি হ'ল না। ইতিমধ্যে, ও ছুটে চলে গেছে ছইয়ের ভিতর, ছইয়ের পিছনের অংশে—নৌকোর শেষ প্রান্তে গিয়ে হালটা ঠিক ক'রে নতুন ক'রে স্রোতের গতির অনুকূলে বেঁধে দিয়ে চলে এল তাড়াতাড়ি।

পালের কাপড়টা ওকে দেখিয়ে দিয়ে বোঝাতে চাইলাম,—এটা তুমি কোমরে জড়িয়ে নাও তো।

ও অবাক হয়ে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমি একটু হেসে ওর কোমরে ধীরে ধীরে জড়িয়ে দিলাম পালটা। ও তখনো অবাক হয়ে আমার কাজটা লক্ষ্য করছিল। খাটো লুঙির মতো নিজের কোমরে ওটা জড়ানো হ'য়ে গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে। এ-ও এক নতুন আস্বাদ ওর কাছে। কিছুকাল নিজেই চলে ফিরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত খুশী হ'য়ে উঠল আনা। মুখচোখ যেন খুশীতে ঝলমল করছে। ইশারায় জানাল—টৌম্বিকে দেখাই ?

—দেখাও।

ও ছুটে গেল ছইয়ের ভিতরে। কিন্তু পরক্ষণেই ঘটল এক অঘটন। তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল টৌম্বি। মাতাপুত্র পরক্ষণেই বেরিয়ে এল ছইয়ের বাইরে। তাকিয়ে দেখি, ওর কোমরের আবরণের প্রান্তটি ধরে প্রাণপণে টানটানি করছে টৌম্বি, ও-ও সমানে বাধা দিচ্ছে, আর তারস্বরে চীৎকার করছে টৌম্বি। টৌম্বিও কি ঐ আবরণটা চায় পরতে ?

আনা ইশারায় জানাল,—না।

সে এক অদ্ভুত মুহূর্ত। টানাটানিতে পালটা না ছিঁড়ে যায় তাই ভাবছি, ইতিমধ্যে দেখি, ওটা শেষ পর্যন্ত খুলেই ফেলল আনা, আর সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত হ'য়ে গেল টৌম্বি !

আনা পালটা তুলে নিয়ে ভাঁজ ক'রে রেখে এল যথাস্থানে। টৌম্বি সেই পাথরের চোখে তাকানোর মতো চেয়ে রইল আমার দিকে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার চলে গেল ছইয়ের ভিতরে।

বুঝলাম,—মায়ের ঐ আবরিত বেশ ওর কাছে অভ্যস্তও নয়, ও সহ্য করতেও পারছে না।

কিন্তু, কেন পারছে না সহ্য করতে ? মাত্র অভ্যস্ত নয় বলে ? না, অন্য কিছু ? কে বলে দেবে ঐ শিশুর মনস্তত্ব ? তাহলে ওর কি ধারণা হচ্ছে, ওর মাকে আমি ছিনিয়ে নেবো ওর কাছ থেকে ?

আমাকে আর ওর মাকে একসঙ্গে দেখলে ও খুশী হয় না, নীরবেই কোন অন্তরাল খুঁজে নিয়ে সরে যায় দূরে।

সে-রাত্রেও যথারীতি শুয়েছিলাম পাটাতনের ওপরে, খোলা হাওয়ায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে। টোম্বিকে ছইয়ের ভিতরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে একসময় আনাও উঠে এল আমার কাছে,—বসে বসে চুপচাপ তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ। তারপরে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল পাটাতনের ওপরে।

চাঁদ ওঠে নি, সমস্ত আকাশ ভরে ঝিলমিল করছে অগণিত নক্ষত্রের আলো। সমুদ্রে কিছুটা বড় বড় ঢেউই উঠছিল সে রাত্রে,—নৌকোটা ঢেউয়ের দোলায় উঠছে আর নামছে। শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখছিলাম সমুদ্রে।

মনে হচ্ছিল, এযেন নৌকো নয়, এযেন সমুদ্র নয়, গহন বন-ভূমি। বনভূমির মধ্যে যেন বিশ্রাম করছি আমরা দুটি আদিম নর-নারী,—নৌকোর ছোট্ট ছইটা যেন আমাদের ডালপালা আর পাতা-ছাওয়া ছাউনি, আর পাটাতনটা গৃহ-প্রাঙ্গণ! আমাদের নৌকোর চারপাশে যেন তরঙ্গের লীলা নেই,—শিশু বনস্পতির দল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র!

যাঁরা গহীন অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে এমন ক'রে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা বুঝবেন, আমার এটা নিছক কল্পনা-বিলাস নয়। নিঃসীম নিস্তব্ধ অন্ধকারে নক্ষত্রের দীপজালা আকাশের চন্দ্রাতপের নিচে চুপচাপ শুয়ে থাকলে সত্যিই মনে হয়,—যেন কোন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে নিশি যাপন করছি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সজোরে আঘাত লেগে অতর্কিতে 'হা-হা' শব্দ জেগে উঠছে উঁচু পর্দায়,—কান পেতে শুনলে মনে হয়, যেন নিথর অরণ্যের অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ ক'রে হঠাৎ জেগে উঠছে হিংস্র হায়েনার হাসি! মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসে

ভাসমান কোন সামুদ্রিক মাছের একরকম অর্ধস্ফুট 'ক্রুট্-ক্রুট্-ক্রুট্-ক্রুট্-ক্রুট' শব্দ, যা শুনে মনে হ'তে পারে,—শাল গাছের মৃত কোন শাখায় গুবরে পোকার দল যেন ক্রমাগত করাত চালিয়ে চলেছে !

অন্ধকার রাত্রে তারার আলোও একধরনের অস্ফুট, চাপা ও সূক্ষ্ম জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করে। রহস্যময় সেই জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সম্মোহিতের মতো শ্রান্ত দেহটা এলিয়ে আনা শুয়ে আছে চুপচাপ। আমি ওর আরও একটু কাছে সরে গিয়ে ডেকে উঠলাম—আনা ?

—ই ?

ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলাম, ধরো, তোমাকে যদি নিয়ে যাই ?

প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বরং আমার ইশারা-ইঙ্গিতের রকম দেখে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কৌতুকময়ী। তারপরে হাসি থামিয়ে ইঙ্গিতেই প্রশ্ন করল,—কোথায় ?

—আমার দেশে। সেখানে মাটি আর মাটি।

কথাটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই কালো হ'য়ে গেল ওর মুখ, —কেমন যেন ভীত, সন্ত্রস্ত মনে হ'ল ওর মুখের ভাব।

বললাম,—কেন ? চাও না মাটিতে ফিরে যেতে ?

ভয়ার্ত দৃষ্টি আমার চোখের ওপর ফেলে ওরা বোঝাল, তার অর্থ এই, মাটিতে বাস ওদের করতে নেই। ওরা জলচারী।

এ-ও সংস্কার। ওর ত্বটি বাহুমূল ধরে বলে উঠলাম,—না। জলে আর জলে বেড়াতে হবে না এরকম।

যেন শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করল আমার ইচ্ছার কাছে, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে বললে,—বেশ। তাই হবে।

আমার আগ্রহের যেন সীমা ছিল না, বলেছিলাম—ঘর বাঁধব দেশে ফিরে গিয়ে। সেখানে থাকব, আমি, তুমি আর টোম্বি। যাবে তো ?

স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেলে ওর মুখ,—তারপরে মাথা হেলিয়ে সম্মোহিতের মতো উত্তর দিল—যাব।

এবং বলতে-না-বলতেই দুটি হাত বাড়িয়ে তীব্র আকর্ষণ করল আমাকে। আদিম অরণ্যে যেন আদিম তৃষ্ণা জেগেছে আদিম রমণীর মধ্যে! আমারও ভিতরে যেন অনুভব করছিলাম মত্ততার সাড়া,—এমন সময়, হঠাৎ কী হ'ল, একটা টাল খেয়ে অতর্কিত ঘুরে গেল নৌকোর মুখ, আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম একবারে নৌকোর একটা কিনারে।

মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়ালো আনা, নৌকোটা তখন এলোমেলো ভাবে একবার কাত হচ্ছে, আরেকবার ঘুরে যাচ্ছে। কোনক্রমে পাটাতনের ওপর পা রেখে আনা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারল না। তারপরে কী যেন দেখে একটা অস্ফুট আর্তনাদ তুলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই বলা যায়,—ঢুকে পড়ল ছইয়ের মধ্যে। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম,—আনার উচ্চকণ্ঠ আর টোম্বির কান্না-মিশ্রিত চীৎকার!

অদ্ভুতভাবে তখনো ঘুরছে নৌকোটা,—আমিও হাতের ওপর ভর দিয়ে-দিয়ে সরীসৃপের মতো দেহটাকে টেনে গড়িয়ে ছইয়ের কাছে নিয়ে এলাম। ভিতরে তাকিয়ে যা' দেখলাম, আর যা' বুঝলাম,—তা' অভাবনীয়। টোম্বির কখন ঘুমে ভেঙে গিয়েছিল কে জানে, এবং কী এক অজ্ঞাত কারণে টোম্বি হালের কাছে গিয়ে হালটা নাড়াচাড়া করতে করতে, হালটা বাঁধা থাকে একটা কাঠের সঙ্গে যে শক্ত দড়ি দিয়ে, সেই দড়িটা দিয়েছে অতর্কিতে খুলে। তার ফলেই এই বিপর্যয়। যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, নৌকো উল্‌টে যাওয়াও আশ্চর্য ছিল না!

কাঁপতে কাঁপতে ততক্ষণে স্থির হ'য়ে গেছে নৌকোটা। আনা শক্ত হাতে হালটা ধরে এদিকে-ওদিকে বারকতক ঘুরিয়ে পুনর্বার স্রোতের অনুকূলে চালিত ক'রে দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বেঁধে দিল

কাঠটার সঙ্গে। ঠাস ক'রে টোম্বির গালে বুঝি চড় কষিয়ে তাকে শাসন করছে তার মা,—সে ছইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে বসে কাঁদতে লাগল আকুল হ'য়ে।

ইশারায় প্রশ্ন করলাম,—মারলে বুঝি?

—মারব না!—বলে আনা ছেলের দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলতে লাগল উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে।

বুঝলাম,—তখনো ওর ওপর রাগ পড়েনি আনার,—সে তখনো ওকে সমানে ধমক দিচ্ছে।

বললাম,—কী করছ! ও ছেলেমানুষ,—ও কী বোঝে?

বলেই ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে কাছে গেলাম ছেলেটার, ওর হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু, আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইল টোম্বি,—আমার দিকে বড় বড় দুটি চোখ তুলে তাকাল,—কী অদ্ভুত সেই দৃষ্টি, ভয়, ঘৃণা আর ক্ষোভ একসঙ্গে মেশানো। একই ভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, কান্না থেমে গেছে, শুধু গলায় একটা হিক্কার শব্দ উঠছে থেকে থেকে।

তাড়াতাড়ি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম বাইরে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এগিয়ে একেবারে সামনেকার গলুই পর্যন্ত। জলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া সরু মুখ গলুইয়ের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে দু' হাতে গলুইটাকে বেষ্টন ক'রে পড়ে রইলাম চুপচাপ।

নিচে, তরঙ্গের লীলা চলেছে অনুক্ষণ। ঢেউয়ের কণাগুলি বৃষ্টির কণার মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে, ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমার মুখ,—ঢেউয়ের মাথায় মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে নীলাভ একটা আলো,—যেন নীল জোনাকি জ্বলছে ঢেউয়ের মাথায় ঝিকমিক ক'রে!

কিন্তু, কতক্ষণ থাকা যায় এভাবে পড়ে? একসময় উঠে, মাস্তুলটার কাছে নৌকোর কিনার ঘেঁষে যেখানে আমি সাধারণত বসি, বা শুয়ে থাকি,—সেইখানে এসে বসে পড়লাম। মেননের কথা বড্ড মনে পড়ছিল। কত দিনেরই বা পরিচয় তার সঙ্গে?

কতটুকুই বা তাকে জেনেছিলাম? তার এক ছোট বোনের কথা সে বলেছিল, যাকে সে খুব ভালবাসত। কোথায় তার সেই বোন, কেরলের কোন্ অঞ্চলে সে থাকে, কবে সে তার দাদার সংবাদ পাবে, কে জানে! যেদিন পাবে, যেদিন জানবে, তার দাদা নেই,—সেদিন সে মেয়েটির কী অবস্থা হবে, তা' ভাবতে গিয়ে নিজেরই চোখের কোণ উঠল সজল হ'য়ে!

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুমরে উঠতে লাগল। আমার কেউ কোথাও নেই, মাও নেই, বাবাও নেই,—তবু, সেই কালীঘাটের পুরানো স্যাঁতসেঁতে গলি, নোনা-ধরা দেয়াল আর সেই পায়রার খোপের মতো ঘর, যেখানে আমরা শৈশবে ভাড়া থাকতাম,—সন্ধ্যেবেলা সেই মই হাতে ক'রে গলির মোড়ে এসে গ্যাস-লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে যেত একটা বুড়ো মতন লোক, সেই বাবার রকে বসে তামাক খাওয়া আর খক্‌খক্ কাশি, সমস্তই যেন ছায়া-ছবির মতো চোখের সামনে একসঙ্গে ভেসে উঠল!

জল-জল-জল।—ছোট বেলায় আদি গঙ্গায় যখন বান আসত শুনতাম,—মার হাত ধরে এক-একদিন যেতাম সেই বান-আসা দেখতে। সেই ঢেউ এসে পাড় ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেত,—ইট বোঝাই ডিঙি নৌকোগুলি উঠত দুলে, আর সেই উদ্বেল উচ্ছল জলরাশি দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে মার বুকে মুখ লুকোতাম। মা বলত,—ভয় কী? এই তো আমি।

ছোট থেকেই জলে আমার ভয় ছিল,—কেন, তা' জানি না। মা যেত কী সব পাল-পার্বণে আদি গঙ্গায় স্নান করতে, মার সঙ্গে যেতাম বটে, কিন্তু, কোন ক্রমে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে একটা ডুব দিয়েই দুদ্দাড় ক'রে পাড়ে উঠে পড়তাম। পাড়ার নস্তুদা একবার জোর ক'রে টেনে ডুব-জলে নিয়ে গিয়েছিল সাঁতার শেখাতে। ঘন ঘন কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে—ভয়ে আতঙ্কে মরি আর কী।

সেই আমি সমুদ্রে ভেসে চলেছি। জল জল আর জল! এক টুকরো মাটি, কী, সবুজ একটু গাছপালা, এ দেখবার জন্য আমার সমস্ত মন, শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত উন্মুখ হ'য়ে আছে!

এর পরের দিন। সূর্যের প্রখর দৃষ্টি ক্রমশ কোমল হ'য়ে বৈকালের সূচনা করছে। ঝিরঝির ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা এক বাতাসও বইছিল। আনা বসেছিল পাশে। জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি, বলতে পারো?

প্রশ্নটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই কালো একটা ছায়ায় ঢেকে গেল ওর মুখ। আমার বাহুমূলে মুখখানা রেখে যা ও বললে, তাতে বুঝলাম কোনদিকে কোথায় যাচ্ছি কিছুই ও জানে না,—এ সব যে জানতে বা বুঝতে পারত,—সে ঐ টোম্বির বাবা।

—পাওয়া?

মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে তারপরে আমার বুকে হাতখানা রেখে বলে উঠল—পাওয়া।

অর্থাৎ, ওর 'পাওয়া' এখন আর সে নয়, ওর 'পাওয়া' এখন আমি। কিন্তু, 'পাওয়া' শব্দটার সত্যিকার অর্থ কী?

স্বামী?

এ কথা ও আগেও বলেছে। কিন্তু—

হঠাৎ চোখ পড়ল দূর দিগন্তে। ততক্ষণ বাতাস একেবারে থেমে গিয়ে থমথম করছে চারিদিক। অদ্ভুত গুমোট একটা গরম অনুভব করছিলাম, যা এ যাবৎ একটা মুহূর্তের জন্যও করি নি।

কিন্তু, দূর হোক গরম। দিগন্তে যা চোখে পড়ল তাতে একেবারে দুরন্ত উল্লাসে লাফিয়ে উঠলাম বলা চলে।

—আনা—আনা!

—কী?

—ঐ দেখ,—গাছপালা,—মাটি!

দূরে শ্যামল একটা রেখা, আরও দূরে উঁচুনীচু পাহাড়ের আভাস, নারিকেল গাছ!

বললাম,—শীগ্‌গির জাঙ্কার মুখ ঘোরাও ঐদিকে।

আনার মুখে কিন্তু আনন্দের আভাও নেই, বরং, একটা দুশ্চিন্তার কালিমা!

বললাম—তুমি জলের মেয়ে, মাটি দেখে খুশী হবে কেন তুমি? কিন্তু, আমি যে—

আমার এতগুলি কথা ওর পক্ষে বোঝা কঠিন, কিন্তু, বোধহয় আমার কণ্ঠস্বর থেকে আমার অন্তরের ক্ষোভটা ও অনুভব করতে পেরেছিল। চকিতে ফেরালো আমার দিকে মুখ, তারপরে আঙুল দিয়ে দিগন্তের অন্য একটা কোণে নির্দেশ করল!

সামান্য কালো একখণ্ড মেঘ।

বললাম—ও কিছু নয়, তুমি হালের মুখ ঘোরাও।

ও আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ছুটে গেল ছইয়ের দিকে। হালটা বোধহয় আমার কথামতো ঘুরিয়েই দিয়েছিল, তারপরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল কাছে, আঙুল দিয়ে আকাশের সেই সামান্য কালির স্পর্শটুকুর দিকে লক্ষ্য রেখে কেমন-যেন কাঁপা, আর্তস্বরে বলে উঠল,—বিলিকু।

'বিলিকু' ব্যাপারটা যে কী, তা' বুঝতে পেরেছিলাম একটু পরেই। দিগন্তের সেই এক ফোঁটা কালো কালি যে কী ভাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সারাটা আকাশ ভরে দিতে পারে, কী ভাবে যে সেই ঘোর কালো রঙ্ শান্ত সমুদ্রটাকে মুহূর্তে প্রমত্ত ক'রে তুলতে পারে, তা' এই চোখ দুটো দিয়েই সেদিন দেখতে পেয়েছিলাম ভাই। ঝড়। প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি।

সমস্ত আকাশটা প্রথমে দেখাচ্ছিল নিকষ কালো। আর, সমুদ্র? পর্বতের মতো স্ফীত আর উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে সমুদ্র-বক্ষ,—পাহাড় কেটে যেমন, ধাপে ধাপে সিঁড়ি তৈরি করে—তেমনি থাকে-

থাকে উঁচু আর নীচু সিঁড়ির মতো দেখা যাচ্ছিল প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢেউগুলি।

একে প্রমত্ত বাতাসের প্রবল সোঁ-সোঁ শব্দ, অন্যদিকে সুগম্ভীর জলকল্লোল, তার মাঝে মাঝে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সংঘাত জেগে প্রলয়ংকর ধ্বনি উঠছে,—আর, নৌকোর যা' অবস্থা হয়েছিল, তা' অবর্ণনীয়। তীরের বেগে ছুটে চলেছিল নৌকো,—কোন্‌দিকে, কে জানে! এক-একবার পর্বত-প্রমাণ ঢেউগুলির মাথায় গিয়ে উঠছে নৌকো, আবার নেমে আসছে! সেই ওঠা আর নামার সময় শিরদাঁড়ার মধ্যে শিরশির ক'রে ওঠে একটা হিমস্রোত!

আনা ছইয়ের মধ্যে বসে টৌম্বিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছে এক হাতে, অন্য হাতে আমাকে, আমিও যেন তার কাছে হ'য়ে গিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে টৌম্বির মতো শিশু!

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, আর সেই মুহূর্তের আলোয় সমুদ্রের যে রুদ্রমূর্তি চোখে পড়ে,—তাতে সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কে চোখ দুটো বুজে ফেলি তাড়াতাড়ি।

প্রবল প্রমত্ত ঢেউগুলি আমাদের ছইয়ের সামনে পাটাতনের ওপরে ভেঙে পড়ছে প্রচণ্ড শব্দে, যে কাঠ দিয়ে এ নৌকো তৈরি, সে কাঠ ডোবে না শুনেছিলাম আনার কাছে,—কিন্তু, ঢেউ এসে ভেঙে পড়তেই ডুবে যাচ্ছে পাটাতন জলের তলায়,—আর, ঠিক সেই মুহূর্তে, ছইয়ের অংশটা আমাদের নিয়ে উঠে যাচ্ছে শূন্যে,—পরমুহূর্তে, পাটাতনের জল সরে গিয়ে পাটাতন ভেসে উঠতেই, আমরা ছইসুদ্ধ শূন্য থেকে নেমে আসছি নীচে।

এলোমেলো তরঙ্গের আঘাতে গতিও ঠিক নেই নৌকোর। একবার নৌকোর মুখ যদি ঘুরে গেল ডাইনে, পরমুহূর্তেই গতি-পরিবর্তন ক'রে একেবারে বাঁয়ে!

ভয়ে দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক ক'রে শব্দ হচ্ছিল টৌম্বির। আমার ভয় হচ্ছিল, সেই যে দিগন্তরেখায় পর্বতরাশি চোখে পড়েছিল,

যদি নৌকো গিয়ে সবেগে আঘাত করে তীরভূমির সেই কোন পর্বতের গাত্র, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে আমাদের নৌকো!

কিন্তু, তার চেয়েও বিপদ আমাদের সামনে। ঐ যে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে পাটাতনের ওপর, ও যদি এখুনি ছইয়ের ওপর এসে পড়ে? তিনটি প্রাণীর দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে একেবারে!

ছইয়ের নিচে যে পাটাতন, যেখানে বাঁশের চোঙাভর্তি জল রাখত আনা,—আমরা তিনজনে গিয়ে সেইখানে আশ্রয় নিলাম তাড়াতাড়ি। এক সময়, প্রবল হাওয়ায় দেখতে-দেখতে নৌকোর ছইটাও উড়ে গেল।

নৌকো প্রবলবেগে দুলতে-দুলতে—টলতে-টল্‌তে তখনো একবার জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে, আবার ঢেউ সরে গেলে ভেসে উঠছে জলের ওপর। খোলের মধ্যে জল ঢুকে প্রায় ভর্তি হ'য়ে এসেছে নৌকো—সর্বাঙ্গ সিক্ত হ'য়ে আমরাও কাঁপছি ঠকঠক ক'রে। এমন সময়, কী এক উদ্বেল ঢেউ উঠে দৈত্যের মতো আমাদের নৌকোটাকে শূন্যে তুলে মুহূর্তের মধ্যে আছড়ে নিচে নামিয়ে দিল জলের ওপর নৌকোটা একেবারে উল্‌টে গেল সঙ্গে সঙ্গে! আর, ক্ষুধার্ত অজগরের মতো অতিকায় ঢেউগুলো আমাদের যেন চারিদিক থেকে গ্রাস ক'রে ফেলল!

আমরা কোনক্রমে সেই উল্‌টে-যাওয়া নৌকোর পিঠের ওপর উপুড় হ'য়ে নৌকোটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দেখি, একহাতে আঁকড়ে ধরে আছি নৌকোর একটা কিনার, অন্যদিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে রয়েছি টৌম্বিকে। আনা সম্ভবত আমার ডানদিকে। ঠিক মনে নেই। মাথার ওপর দিয়ে ঢেউগুলি কলকল ক'রে বয়ে চলেছে! আর আমরা ভেসে চলেছি তৃণখণ্ডের মতো জল খেয়ে আর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে বিপর্যস্ত হ'য়ে। কিন্তু, মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাবার সময়, কতক্ষণ দম বন্ধ ক'রে থাকতে পারবে টৌম্বি?

কী যে হয়েছিল ঠিক মনে নেই, যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তাকিয়ে দেখি, একখানা কাঠের ঘর, সুন্দর সাজানো,—ধবধবে চাদরপাতা নরম গদীর বিছানায় শুয়ে আছি। দেয়ালের তাকে শ্বেত পাথরের বেশ বড় একটি বুদ্ধমূর্তি। হল্‌দে রঙের সিল্কের চাদর গায়ে, মুণ্ডিত মস্তক, সৌম্য, শান্ত মুখশ্রী,—এক বৃদ্ধ একটু ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। আমি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলাম,—এ কোথায় আমি?

ইংরেজিতেই উত্তর এল,—এটি একটি 'ফুঙিচঙ্‌'। অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহার। জায়গাটার নাম,—আকিয়াব।

আকিয়াব!—নামটা শুনেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলাম মনে মনে। চোখের সামনে ভেসে উঠল, ঝড়ের সময় দেখতে পাওয়া মেঘের মতো সেই প্রকাণ্ড পাহাড়! তাহলে সত্যিসত্যিই এসে পড়েছিলাম তীরের কাছাকাছি! এবং সে তীর আর অন্য কিছু নয়, একেবারে মূল ভারতবর্ষের মাটি, বাংলাদেশেরই কাছাকাছি কোন প্রান্তসীমা!

মুহূর্তে যেন দূর হ'য়ে গেল দেহের সমস্ত দুর্বলতা, আনন্দে ও উত্তেজনায় একেবারে উঠে বসতে গেলাম বিছানার ওপরে, কিন্তু পারলাম না, মাথাটা আবার নামাতে হ'ল বালিশে। আকিয়াব! আকিয়াবে এসে যখন পৌঁছেছি, তখন দেশে পৌঁছতে আর কী অসুবিধা? আকিয়াব থেকে কলকাতা আর কতদূর? কোনক্রমে আকিয়াব থেকে চট্টগ্রাম যেতে পারলেই হ'ল। কিন্তু, আনা?··· বললাম,—আপনার পরিচয়টা যদি দয়া ক'রে···

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—আমি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। এই বিহারে থাকি। মাস্কি পয়েন্টের কাছে কালাডোন নদীর মোহানা থেকে একটা চরে জেলেডিঙি আপনাদের উদ্ধার করে একটা চরে এসে লেগেছিলেন আপনারা।

—আপনারা !—বলে উঠেছিলাম,—তবে কি আমার আর সব—

—আপনার স্ত্রী-পুত্র তো ? বেঁচে আছে।—সন্ন্যাসী বললেন, —তবে, বড় কষ্ট পেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের পরনের কাপড়টুকু পর্যন্ত ঝড়ের দেবতা কেড়ে নিয়েছিলেন।

বলতে গিয়েছিলাম—না—না, তাদের পরনের কাপড় ঝড়ের দেবতা কেড়ে নেবেন কেন ? তাদের নিজেদেরই···

কিন্তু বললাম না,—সমস্ত কিছুই আগেভাগে কি উদ্ঘাটন করা যুক্তিযুক্ত হবে, অতএব চুপ ক'রে রইলাম। সন্ন্যাসী বলতে লাগলেন,—সমুদ্রের ঝড়ে 'চাকদাড়া' বলে একটা জাহাজ ডুবে গেছে, আমরা খবর পেয়েছি। আপনারা ঐ জাহাজেই ছিলেন তো ? রেঙ্গুন থেকে আকিয়াব আসছিলেন ?

অবাক হ'য়ে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে। জাহাজ ! রেঙ্গুন ! বলছেন কী এসব উনি ! বুঝলাম—প্রচণ্ড একটা ভুল করেছেন সন্ন্যাসী। কিন্তু এটা ভালোই হয়েছে আমাদের পক্ষে। এতএব ওঁর ভুল আমি আর ভাঙালাম না, বললাম, —হ্যাঁ !

—জাহাজ-ডুবির সময় বোটে চড়েছিলেন তো ? বোটটা কিন্তু আপনাদের অদ্ভুত। সাধারণ জাহাজী বোট নয়। আমাদের ঘাটে আমরা বেঁধে রেখেছি। ভেঙে-চুরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আমার লোকেরা সবকিছু মেরামত ক'রে রেখেছে। খুব হালকা কাঠ, কখনই জলে ডুববে না, ভেসে থাকবে। জাহাজের লোকেরা বোধ হয় বর্মীদের কাছ থেকে কিনে রেখেছিল ?

বললাম,—আজ্ঞে, তা হবে। মৃত্যুর মুখে এসে কিছুই তো ঠিক থাকে না মানুষের। আমাদের হয়ত ঐ নৌকোটা ক'রেই জলে নামিয়ে দিয়েছিল।

একটু বিস্মিত হ'য়েই বলে উঠলেন,—প্যাসেঞ্জারদের জলে নামাবার সময় পেয়েছিল ওরা ?

বললাম,—ঠিক মনে নেই। হয়ত নিজেরাই কোনক্রমে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়েছিলাম। সে-এক মরিয়া অবস্থা।

—তা তো বটেই—তা তো বটেই!—সন্ন্যাসী বললেন,—আপনি কিন্তু এখনো খুব দুর্বল, বেশি ওঠা-হাঁটা করবেন না। আপনার স্ত্রীকে বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি,—তিনি রীতিমত সবল রয়েছেন! ইন্‌ফ্যাক্ট, বেশ ভালো স্বাস্থ্য আপনার স্ত্রীর। তবে, একটা সক্ পেয়েছেন তো? বোধ হয় সেইজন্যই বাক্‌রোধ হ'য়ে গেছে, কথা বলতে পারছেন না। আপনার ছেলেটিও ভালো আছে, তবে সেও আপনার মতো দুর্বল, খুব ঘুমোচ্ছে দেখে এসেছি। আপনি কিছু ভাববেন না, আমাদের আশ্রমের একটি পালিতা কন্যা আছে, সেই সব দেখাশুনা করছে।

বলে দরজার দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন, ঘুরে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। বললেন,—ভালো কথা, আপনার পরিচয়টা কিন্তু জানা হ'ল না। আপনি যাবেন কোথায়?

বললাম,—কলকাতায়। কিন্তু আমাদের টাকা-পয়সা—

—সেজন্য ভাববেন না, একটা ব্যবস্থা হবেই! কিন্তু, আপনি কি বাঙালী?

—হ্যাঁ!

—কী আশ্চর্য!—সন্ন্যাসী এবার পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন,—আপনি বাঙালী, অথচ, আমি বিজাতীয় ভাষায় কথা বলে যাচ্ছি আপনার সঙ্গে!

প্রচণ্ড আবেগে ওঁর হাত দুটি ধরে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠেছি, আপনিও বাঙালী!

হেসে বললেন,—সন্ন্যাসীর কোন জাত-কুল নেই, তবু বলছি, আমি বাঙালী। দাঁড়ান, আমাদের এখানে আর-একজন বাঙালী আছে, তাকে ডাকি।

বলেই ডেকে উঠলেন,—রঞ্জু? রঞ্জু? কোথা গেলে, মা? রঞ্জনা?

—যাই বাবা!—সাড়া দিয়ে তেইশ-চব্বিশ বছরের ছিপ্‌ছিপে গড়নের একটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল। সন্ন্যাসী বললেন,—এ ভদ্রলোক কে জানিস? বাঙালী।

চোখ-মুখ যেন খুশীর আলোয় ঝলমল ক'রে উঠল মেয়েটির, বললেন,—বাঙালী!

—হ্যাঁ।

হলদে রঙের একটা শাড়ি পরনে, সদ্য স্নান ক'রে এসেছেন বলে উদ্দাম কেশকলাপ তখনও ভিজে।

সন্ন্যাসী বললেন,—আমি প্রার্থনায় যাই! তুমি এবার তোমার রোগীর ভার নাও মা।

—আচ্ছা বাবা।

সন্ন্যাসী চলে গেলেন! অদূরের কোন ঘর থেকে গম্ভীর একটা দামামার শব্দ আসছে ভেসে, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবগভীর সমবেত কণ্ঠস্বর,—'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি।'…

মেয়েটি ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, খুশীতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে যেন দুটি চোখের বাম্ময় আঁখিতারা, বললেন,—বাঙালী? কী নাম?

বললাম,—অনুকূল মল্লিক। কিন্তু ডাকত সবাই 'টুহি' বলে।

—টুহি? সে আবার কী নাম!

—টুহি হচ্ছে এক রকমের পাখী। সেই পাখীর নামে আমার নাম। আপনি বাংলাদেশের মেয়ে বলে কি সব পাখীর নামই আপনি জানেন? বাংলার কোথায় আপনার দেশ?

হাসি হাসি মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হ'য়ে গেল মেয়েটির, বললে,—সে শুনে আর কী করবেন? আমি আজ ছ' বছর দেশ ছাড়া। বছর দুই হ'ল বাবা আমাকে এই ফুঙিচঙে এনে রেখেছেন।

—ঐ সন্ন্যাসীটি আপনার বাবা?

—না। আমি বাবা বলে ডাকি।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললাম,—এর পরে ঈশ্বর নেই, এ কথা বলি কী ক'রে? এভাবে যে বেঁচে উঠব, এভাবে যে আপনাদের হাতে এসে পড়ব, একি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম! আমার কণ্ঠে আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য ক'রেই তাড়াতাড়ি যেন মেয়েটি মুখ থেকে সমস্ত বেদনার ছাপ মুছে ফেলে চঞ্চলতায় ভরিয়ে দিলেন নিজেকে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে উঠলেন,—কদিন শুয়ে আছেন বলুন দেখি? তিনদিন। খুব জ্বর খেয়েছিলেন আর কী! শহর থেকে ডাক্তার আনতে হয়েছিল।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। কিন্তু দাঁড়ান, আপনার দুধটা নিয়ে আসি।

আমি কিছু বলবার বা বাধা দেবার পূর্বেই মেয়েটি নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন ঘর থেকে।

জাফরী-কাটা জানালাগুলি দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। কোথায় যেন কোন্ গাছের ডালে বসে একটা পাখী ডেকে চলেছে, আর আশ্চর্য, পাখীর ডাকটিও অদ্ভুত লাগছে, যেন থেমে থেমে পাখীটা ডাকছে,—টুহি, টুহি!

একটু পরেই আবার এলেন মেয়েটি, হাতে তাঁর দুধের গ্লাস। মুখের কাছে গ্লাসটি এনে ধরতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—দিন, আমি নিজেই খাচ্ছি।

তারপর খাওয়া হ'য়ে গেলে ঝক্‌ঝকে কাঁসার গ্লাসটি হাতে নিয়ে মেয়েটি অদ্ভুত তরল কণ্ঠে বলে উঠলেন,—আচ্ছা, বাঙালীর ছেলে যখন, হঠাৎ বর্মী বিয়ে করতে গেলেন কেন, শুনি? আর ঐ ছেলে? ও কী আপনার? মনে তো হয় না। সত্যি বলুন তো, বিধবা বিয়ে করেছেন বুঝি?

সব কথারই উত্তর মনে এসে গিয়েছিল, কিন্তু কী ভেবে যেন বলে উঠেছিলাম,—হ্যাঁ। অর্থাৎ আপনি যা অনুমান করেছেন, সব সত্যি।

একটুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপরে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন,—অদ্ভুত !

—কী বললেন ?

—না, কিছু না। দাঁড়ান, আপনার বউকে নিয়ে আসি।

বউ !—অদ্ভুত লাগল শব্দটা। যেন বহু মেঘের স্তর ভেদ ক'রে, বহু দূরের আকাশ থেকে ভেসে এল একটা শব্দের তরঙ্গ—বউ--উ—উ !

কিছুক্ষণ পরেই দরজার কাছে খুট্ ক'রে একটা শব্দ। দরজা খুলে কে যেন আনাকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

নির্বাক—বিস্ময়ে আমি আনার দিকে তাকিয়ে আছি ! আনা নয়, যেন সত্যিসত্যি কোন রাজকন্যা আমার কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার চুল খোঁপা ক'রে বাঁধা, কপালে কুঙ্কুমের টিপ, বুকে বডিসের ওপরে পাতলা সাদা ভয়েলের নক্সা-কাটা ব্লাউজ, পরনে বর্মীদের মতো গোলাপী সিল্কের একটা লুঙি।

—আনা !

আনা ধীরে ধীরে কাছে এসে অবশেষে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে,—বলা বাহুল্য, আমারও চোখের কোণ শুষ্ক ছিল না—ওর উচ্ছ্বাস একটু কমে আসতেই মুখখানা দু'হাতে তুলে মুখের কাছে নিয়ে এলাম। অদ্ভুত ক্ষুধিত দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে, অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ সে-দৃষ্টি। যেন বলতে চায়,—ওগো, তুমি ছাড়া আর আমার কে সাথী আছে বলো ! বিহ্বল কণ্ঠে সে বলে উঠল,—বর !

বর।...অদ্ভুত একটা সুরের আস্বাদ পেলাম ওর মুখে কথাটা শুনে।

কিন্তু কে শেখালো ওকে এই ভাষা ! মনোরম এই সম্বোধনের ভঙ্গী ! বুঝলাম, যে ওকে এমন ক'রে সাজিয়ে আমার কাছে

পাঠিয়ে দিয়েছে, ওর মুখে ভাষা দিয়েছে, সে-ই। কিন্তু কেন এ কৌতুক ?

আনা আমাকে দু'হাতে ধরে, আস্তে আস্তে উঠিয়ে বসালো, তারপরে নিজের পোষাক দেখিয়ে বললে,—অবশ্য হাত-পা নেড়ে ইশারা-ইঙ্গিতেই বটে,—কেমন লাগছে আমাকে ?

বললাম,—সুন্দর !

শব্দটা না বুঝলেও ভাবে বুঝল কী আমি বলতে চাইছি !

কিন্তু বুঝতে পেরেও একটা আশ্চর্য কাণ্ড ক'রে বসল আনা। টান মেরে তাড়াতাড়ি পরনের লুঙিটা খুলে ফেলতে গেল সে।

আমি উপায়ন্তর না দেখে চীৎকার ক'রে উঠলাম,—রঞ্জনা দেবী —রঞ্জনা দেবী !

উনি বোধ হয় দরজার কাছেই ছিলেন, তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন,—কী ব্যাপার !

বলার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন তিনি। আমিও ভিন্নদিকে পাশ ফিরে শুলাম। বলে উঠলাম,—আমার স্ত্রীর মাথায় একটু গোলমাল আছে রঞ্জনা দেবী, আপনি দয়া ক'রে একটু সামলান।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত, রঞ্জনা দেবী বলে উঠলেন,—শুনছেন ? এই দিকে ফিরুন। দেখুন কাণ্ডটা !

লুঙিটা আগের মতোই আবার পরেছে আনা, কিন্তু দু'হাতে রঞ্জনাকে এমন জড়িয়ে ধরেছে যে বোধ হয় হাঁপিয়েই উঠেছেন তিনি। বললেন,—এ কী বলছে জানেন ! এই দেখুন।

আনা আমার দিকে তাকিয়ে রঞ্জনাকে দেখিয়েই যা বলতে লাগল, তার ভাব বোঝা কারুর পক্ষেই কষ্টসাধ্য নয়। বলছে,— রঞ্জনার শাড়িটা সে পরবে।

এবং শুধু পরার ইচ্ছা জ্ঞাপন ক'রেই সে ক্ষান্ত হয় নি, ওঁর আঁচল ধরে রীতিমত টানাটানি শুরু ক'রে দিয়েছে !

রঞ্জনা বিব্রত হ'য়ে বলে উঠলেন,—আচ্ছা বউ যোগাড় করেছেন কিন্তু আপনি। একে বর্মী, তায় মাথার গোলমাল, তার ওপরে শাড়িটা—বোবা।

—বোবা!—বলে উঠলাম,—না, না বোবা নয়, ওর ভাষা বুঝি না, ও-ও আমার ভাষা বোঝে না। তাই আকারে-ইঙ্গিতে কাথাবার্তা চলছে আমাদের!

রঞ্জনা অবাক হ'য়ে একেবারে গালে হাত দিলেন, বললেন,—ওমা! ভাষাও বোঝেন না ওর! নতুন বিয়ে করেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

মুখ টিপে একটু হাসলেন, বললেন,—বুঝলাম। তাহলে বিয়ে হয়েছে অন্য কারণে। ভাব-সাব ক'রে নয়।

লজ্জিত হ'য়ে একটু হাসলাম, বললাম,—কী ক'রে তা বুঝলেন আপনি?

একটু থেমে তারপরে মুখটা নিচু ক'রে বললেন,—ভাষা না হলে ভাব জমে বুঝি!

বলেই আর দাঁড়ালেন না, আনাকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন বাইরে।

ঘরখানাকে বসে বসে লক্ষ্য করছিলাম ততক্ষণ। চার-পাঁচটা আলমারি-সুদ্ধ বই, তাকের ওপর পাশাপাশি সাজানো। অতি পরিপাটী।

কিছুক্ষণ পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, বললেন,—এই যে, একেবারে উঠে বসেছেন দেখছি! বেশ সুস্থ বোধ করছেন তো?

করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে বললাম,—নতুন জীবন দান করেছেন আপনি।

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—ছি-ছি, ও কথা বলবেন না, জীবন

দান করবার আমরা কে! 'পানং ন হানে!'—'কোন প্রাণ সংহার ক'রো না,'—বোধিসত্ত্বের এই বাণী স্মরণ ক'রে আমরা কোন প্রাণীকে বধ করি না, এই পর্যন্ত।

বলতে বলতে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন কাছে, বললেন,—আপনাদের নৌকোটা মেরামত ক'রে আমার অনুগত লোকেরা কালাডোন নদীতে দাঁড় বাইছে মহানন্দে। বেতের ছটা দিয়ে সুন্দর ছই তৈরি করেছে একটা। আপনি পরে দেখে খুশী হবেন। তা যাক্ সে-সব, এখন হাতে একটু সময় আছে, আপনার কথা একটু শুনি।

বললাম,—কিন্তু সন্ন্যাসীজী, আমার টাকা-পয়সার কিছু দরকার হ'য়ে পড়েছে। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে তো? তার পাথেয় দরকার। আমি বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করতে চাই।

—তা করুন, কিন্তু টাকা-পয়সার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমাদের কাছ থেকে নিন, পরে না হয় শোধ ক'রে দেবেন।

বলে হেসে উঠলেন শিশুর মতো সহজ সুরে, অকৃত্রিম সারল্যে।

বললাম,—সন্ন্যাসীজী, তাহলে আমার টেলিগ্রাম ক'রেও দরকার নেই বাড়িতে। ইনফ্যাক্ট বাড়িতে আমার কেউ নেইও। টেলিগ্রাম যদি করতে হয় তো, কোন বন্ধুকে করতে হবে। কিন্তু···

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন.—কী করতেন আপনি রেঙ্গুনে?

—কিছুই করতাম না!—বললাম,—মিলিটারীর কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম।

—আচ্ছা!—সন্ন্যাসী বললেন,—তাহলে আপনি সোলজার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলে ফেললাম,—কিন্তু কাউকে অনুগ্রহ ক'রে বলবেন না। আপনি বাঙালী, সেই বিশ্বাসেই আপনাকে বললাম, রঞ্জনা দেবীও বাঙালী, হয়ত ওঁকেও সেজন্য বলব, কিন্তু খবরটা জানাজানি হ'লে আবার আমার যুদ্ধে ডাক পড়বে। আর যুদ্ধ চাই না।

বোধ হয় বলতে বলতে অবরুদ্ধ আবেগে গলাটা আমার ধরে আসছিল, তা' লক্ষ্য ক'রে আবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন সন্ন্যাসী, বললেন,—যুদ্ধ আর হবে না। যুদ্ধ বন্ধ হ'য়ে গেছে পরশুদিন। আমাদের এ অঞ্চল থেকে ইতিমধ্যেই সৈন্যদল ফিরে গেছে।

উত্তেজনায় একেবারে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম,—কী বলছেন! সত্যিই যুদ্ধ থেমে গেছে!

—হ্যাঁ।—তাড়াতাড়ি উঠে আমাকে আবার বসিয়ে দিলেন বিছানায়। শরীরটা তখনও থরথর ক'রে কাঁপছে আমার। বললেন,—অত উত্তেজিত হবেন না।

বললাম,—তা হলে আমার ভয় নেই। হেড কোয়ার্টার্সে জানালেই ওরা সব ব্যবস্থা করবে।

একটু হাসলেন, বললেন,—সে-সব পরের কথা। আগে সুস্থ হ'য়ে নিন। এখানকার জলহাওয়া ভালো, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে আপনার কিছুদিন থাকলে।

—কতদিন থাকব?

—যে ক'দিন আপনার ইচ্ছে। রঞ্জু-মা তো বলছিল, একটি মাসের আগে আপনাদের সে ছেড়ে দেবে না।

—কেন? এ কথা তিনি বললেন কেন?

একটু থেমে বললেন, সেন্টিমেণ্ট আর কী! দেশের লোকের মুখ তো দেখেনি বহুদিন, তাই খুশীতে একেবারে উপচে পড়ছে! সত্যি কথা বলতে কী, আপনার অজ্ঞান হ'য়ে থাকার সময় আপনার যা সেবা-যত্ন করেছে, তা আমার মঞ্জু-মায়ের পক্ষেই সম্ভব।...

—উনি! উনি আমার সেবা করেছেন!

মুখে সেই অপূর্ব স্নেহঝরা হাসি, সন্ন্যাসী বললেন,—অমন মেয়ে আর হয় না! আশ্রমের যারই কোন পীড়া হোক, ও বুক দিয়ে পড়বে।

বললাম,—কিছু মনে করবেন না, উনিও কি এ আশ্রমের সন্ন্যাসিনী? ম্লান একটু হাসলেন, বললেন,—না না, দীক্ষিতা ভিক্ষুণী ও নয়, কিন্তু কী আর বলব, আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবেন, সন্ন্যাসিনী না হ'য়েও সন্ন্যাসিনীর জীবন-যাপন করছে বলা যায়।

চুপ ক'রে রইলাম কিছুক্ষণ। সন্ন্যাসী, দেখলাম, কথাও বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে জপও চলেছে ওঁর।

বলে উঠলাম,—আমি যে বাঙালী, আমার অসুখের মধ্যেও উনি তা বুঝতে পারেন নি না?

সন্ন্যাসী বলেলেন,—কী ক'রে পারবে? আপনি যে নিথর-নিশ্চল শুয়ে ছিলেন—একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি—পড়ে ছিলেন আচ্ছন্নের মতো!···হ্যাঁ, ভালো কথা,—রঞ্জনার কাছে সব শুনলাম। বর্মী বিয়ে করেছেন, কিন্তু ছেলেটি বুঝি আপনার নয়?

বললাম,—ঠিকই ধরেছেন আপনারা।

—তা আপনি তো স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবেন, ছেলেটিকে আমার হাতে দিয়ে যান না?

—আপনার হাতে?

—হ্যাঁ। ওর নাম কী?

—টৌম্বি।

—বেশ। টৌম্বিকে আমার হাতে দিন। ও আমার কাছেই থাকবে। ওকে আমি আমার মতো 'ফুঙি' বা সন্ন্যাসী তৈরি করব।

—কিন্তু, ওর মা কি···

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—মনে হয় ওর মা রাজী হবে। বর্মীরা 'ফুঙি'দের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে, ছেলে 'ফুঙি' হবে, সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবন-যাপন করবে, এতে ধর্মপ্রাণা বর্মী নারীর কোন আপত্তিই থাকে না।

—কিন্তু, ও যে·

উত্তেজনার বশে এইটুকু বলে উঠেই পরমুহূর্তে থেমে গেলাম। আনা আর টোম্বিকে ওরা বর্মী মনে করছে! যদি সত্যি ঘটনা ওদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করি, তাহলে যদি আনাকে ওরা আমার হাতে না দেয়! যদি আনাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসে ওদের কোন নির্জন দ্বীপে?

ঠিক সেই দিন, সেই মুহূর্তে, একথা মনে হয়েছিল কেন, তা বলতে পারব না। সন্ন্যাসী আমার হাতখানা ধরে বললেন,—কোন জোর করব না আপনাদের ওপর, কিন্তু যদি টোম্বিকে আপনার করতে পারি তো আপত্তি করবেন না, কেমন? ছেলেটি বড় শান্ত, বড় ভাবুক। এই বয়সে এই রকমটা দেখা যায় না।

একটু থেমে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, তারপরে বললাম, তা'—বটে।

সন্ন্যাসী বললেন,—না হয় একমাস কেন, আরও কিছুদিন—মানে, বেশ কিছুদিন থেকে যান না এখানে? নিজেদের চোখে দেখে যান টোম্বির ব্যবস্থা। আমাদের ফুঙিচঙের সীমানা একেবারে কালাডোন নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীর ঘাটটাও আমাদের তৈরি। ঘাটের কাছে একটি কুঁড়েঘর আছে, সেটা যুদ্ধের জন্য এক মিলিটারী অফিসারকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। সে আমার হাতে চাবি দিয়ে চলে গেছে কাল, যদি বলেন তো, তার ঘরে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিই।

সংক্ষেপে বললাম,—বেশ, তাই দিন।

এর কয়েক মুহূর্ত পরেই রঞ্জনা দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন আনাকে নিয়ে। টক্‌টকে লাল একটি শাড়ি পরিয়েছেন তাকে, এমনকি মাথায় ঘোমটা পর্যন্ত তুলে দিতে ভোলেন নি। ব্রীড়াবনতা নববধূর মতো রঞ্জনার পাশে পাশে আমার কাছে এসে দাঁড়াল আনা।

রঞ্জনা বললেন,—সিঁদুর নেই, থাকলে তাও দিয়ে দিতাম সিঁথিতে! দেখুন একবার হুবহু বাঙালী বউ বলে মনে হচ্ছে কিনা।

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন সন্ন্যাসী, বললেন,—অসাধ্য সাধন করলে মা তুমি। সত্যি সত্যি বর্মীনীকে বাঙালিনী ক'রে ছাড়লে!

—না বাবা! রঞ্জনা বললেন,আমি নয়। আমাকে দেখে নিজেরই ঝোঁক হ'ল শাড়ি পরবার।

আমার দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে বললেন,—ঐ উনি জানেন! তারপরে সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে,—কিন্তু, এক বিপদ হয়েছে বাবা। ছেলে আর মাকে চিনতে পারছে না! মার কাছে যেতে চাইছে না।

সন্ন্যাসী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন,—টোম্বির কথা বলছ তো? আমি ওর মনে মনে নাম দিয়েছি, শীলব্রত। পঞ্চশীলের ব্রত-সাধন করবে ও! দেখলে না মা, তখন কেমন এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে? যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি ওর কাছে।

॥ ৬ ॥

আকিয়াবের এই 'ফুঙিচঙ'টি একেবারে একটি টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। খানকয়েক কাঠের ঘর নিয়ে এই 'ফুঙিচঙ'— শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে বিছিন্ন,—নিরালা।

'ফড়া' অর্থাৎ বুদ্ধদেবের পূজামণ্ডপ যেটি, সেটি বেত আর বাঁশের সংমিশ্রণে জাফরী-কাটা জানলায় ঘেরা মনোরম একটি নিভৃত কক্ষ। সেই ঘরের জানালা দিয়ে কালাডোন নদীর মোহানা চোখে পড়ে। মোহানার কাছেই 'মাঙ্কি পয়েণ্ট' বলে বেড়াবার একটা সুন্দর জায়গা। বন্দরে জাহাজ-চলাচলের সাঙ্কেতিক নির্দেশ-লিপি বহন ক'রে এধারে-ওধারে কয়েকটা ফ্ল্যাগষ্টাফ দাঁড়িয়ে আছে, তীর থেকে শুরু ক'রে সমুদ্রের ভিতরেও কিছুটা দূর অবধি চওড়া একটি জায়গা নিয়ে বাঁধ বাঁধানো। বিকেলের দিকে বহু নরনারীর সমাবেশ হয় সেখানে। যেন মেলা বসে যায়।

টিলার ওপর থেকে একটা পায়ে-চলা-পথ—কিছুদূর পর্যন্ত

এঁকেবেঁকে, পরিশেষে খাড়া উতরাইয়ের পথে কালাডোন নদীর ঘাট পর্যন্ত নেমে গেছে। এই ঘাটের কাছেই পরিত্যক্ত একটা 'ও-পি' বা 'অবজারভেশন পোষ্ট'। চার পাশের কাঁটাতারের বেড়ায় মরচে ধরেছে, যথেচ্ছ জঙ্গল উঠেছে এদিক-ওদিক,—আর লতাতন্তু জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে সেই বেড়ার ওপরে।

কী এক আকর্ষণে পায়ে-পায়ে ঢুকে গেলাম 'ও-পি'-টার ভিতরে। অন্ধকার। জিনিসপত্র কিছু নেই,—টুকরো-টুকরো কাগজ পড়ে আছে এদিক-ওদিক। একটা ফোকরের কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের উধাও নদীর মোহানার দিকে দৃকপাত করতে করতে সেই আমাদের 'ও-পি'টার কথা মনে পড়ছিল, যেটার মধ্যে আমরা লুকিয়ে ছিলাম,—আমি আর মেনন।

কথায় বলে,—বানানো গল্পের থেকে অনেক সময় জীবনে বাস্তব যা ঘটে, তা' ঢের বেশী অভিনব, ঢের বেশী আশ্চর্যজনক। মেননের কথা ভাবতে ভাবতে এই চিন্তার মধ্যেই ডুবে গেল মনটা। মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে কোথায় গেল সে, কোন্ সে অজানা বিশ্বে, আর কোথায় আমি ?

সাধারণ বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র্য ছিল না,—সেই 'খাড়া-বড়ি-থোড়,' আর 'থোড়-বড়ি-খাড়া'! এল যুদ্ধ, বাঙলার বুকে এল প্রাণান্তকর বিপর্যয়, পঞ্চাশের মন্বন্তর,—সব মিলিয়ে বাঙালীর গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবন গেল ভেঙে, আর নগর-কেন্দ্রিক জীবন-যাত্রার মান যেন ওলট-পালট হ'য়ে গেল মুহূর্তে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বাঙালীর ছেলে প্রাণ-মানের দায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধের নানান কাজে, প্রত্যক্ষে অথবা অপ্রত্যক্ষে। কত ছেলে গেল কত দূর দেশে,—অর্জন করল কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা!—এইভাবে, বৈচিত্র্য এল না কি বাঙালীর জীবনে ?

আজকের বৈচিত্র্য অবশ্য আরও বেশী, আরও ব্যাপক। দেশটাই যেখানে ভাগ হ'য়ে গেল, দেশের মানচিত্রের দিকে তাকালে

যেখানে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন একটা ভূভাগের চিত্র চোখে পড়ে,—সেখানে পাশাপাশি, ঠেসাঠেসি ক'রে কেমন ক'রে—কতদিন ধরে বাস করতে পারে সমগ্র একটা জাতি? তাই, বহু লোককেই ছিটকে পড়তে হয়েছে দূরে, আরও হয়ত হবে। বাঙালীর জীবনে অভিজ্ঞতার অভাব? বৈচিত্র্যের অভাব? কিন্তু, থাক সে কথা!

পরিত্যক্ত 'ও-পি'টার পাশেই ছিল সেই মিলিটারী অফিসারের দখল-করা কুঁড়ে ঘবটি। দোতলা কাঠের ঘর। ঘর একটিই, তবে বেশ বড়, আর চার পাশেই বারান্দা দিয়ে ঘেরা। বারান্দার এক কোণে ছিল গোটা তিনেক সবুজ রঙ-করা বেতের চেয়ার, গোলাকার বেতের একটা টিপয়। এবং ঘরের মধ্যে ছিল প্রকাণ্ড একটা খাট,—একপাশে একটা আল্‌না, একটা আলমারি, টেবিল আর চেয়ার।

আমাদের সঙ্গে নিয়ে রঞ্জনা দেবীই এসেছিলেন ঘর-দোরের ব্যবস্থা করতে। বললেন,—ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হবে সব। কেমন একটা ইংরেজ-ইংরেজ গন্ধ রয়েছে। দাঁড়ান, সব ঠিকঠাক ক'রে দিচ্ছি। বলে নিজেই কোমরে আঁচল জড়িয়ে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

বললাম,—আমি কি আপনার কোন সাহায্যে লাগতে পারি না?

বললেন,—বাঁ-হাতটি তো এখনো ভালো ক'রে নাড়তে পারেন না, সাহায্য করবেন কেমন ক'রে!

আমরা কথা বলছি, আনা কিন্তু ততক্ষণে চুপচাপ বসে নেই। কী বুঝেছিল সে কে জানে, রঞ্জনাকে লক্ষ্য ক'রে বুকের আঁচলটা সম্পূর্ণ নামিয়ে ফেলে কোমরে জড়াতে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি। সকাল-বেলা, গরম পড়েওনি তেমন, সুন্দর হাওয়া বইছে খোলা জানালাগুলি দিয়ে,—কিন্তু এরই মধ্যে ওর গায়ের জামাটা ঘামে ভিজে গেছে রীতিমত।

ওকে নির্দেশ ক'রে রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললাম,—ঐ দেখুন।

বলেই মুখ ফিরিয়ে আমি চলে গেলাম একটা জানালার কাছে।

শুনতে পেলাম রঞ্জনার কণ্ঠস্বর,—ও আমার কপাল! এমন ক'রে বুঝি কোমরে আঁচল জড়ায়? এই দেখো, আমি কী ক'রে পরেছি!

বলে ওর পোষাকটা ঠিক ক'রে দিলেন রঞ্জনা। তারপরে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলেন,—শুনছেন? এই দেখুন, সব ব্যাপারেই আনা আমাকে অনুসরণ করতে চায় কেন বলুন তো? বর্মী মানুষ, বর্মী পোষাকই না হয় পরুক, তা নয়, আমার মতন ক'রে শাড়ি পরা চাই।

বলতে না বলতেই হেসে ফেললেন রঞ্জনা, সস্নেহে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,—আমার পাগলী বোনটি! এ কোথায় এসেছিস বল তো? এখানেই তোরা দুটিতে থাকবি। এটাই তোদের ঘর। বুঝলি? বল্ দেখি,—ঘর?

বার কয়েক আবৃত্তি করবার পরই আনা বলতে পারল,—ঘর।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—ঠিক উচ্চারণ করেছে তো!

রঞ্জনা মুখ টিপে একটু হেসে বললেন,—মেয়েদের আসল কথা শিখে নিতে মেয়েদের বেশী সময় লাগে না। 'ঘর' যে কী জিনিস, —তা' একবার যখন শিখে নিয়েছে, দেখবেন আর কখনও ওর ভুল হবে না।

তারপরেই এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলে উঠলেন,—যান, আপনি বারান্দায় গিয়ে বসুন। আমরা দু'বোনে ঘর-দোর পরিষ্কার ক'রে ফেলছি।

সে এক দেখবার মতোই দৃশ্য হ'ল বটে। আশ্রমের জন্য জল তুলে নিয়ে আসে যে-লোকগুলি বাঁকে ক'রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, তাদেরই একজনকে ডেকে নিয়ে এলেন রঞ্জনা,—শুরু হ'ল জল তোলা। সেই জল গৃহ সংস্কারের কাজে লাগতে লাগল।

আনা করল কি, সিঁড়ি দিয়ে তরতর ক'রে নিচে নেমে গিয়ে নিয়ে এল কিছু নারকেলের ছোবড়া সংগ্রহ ক'রে,—সেগুলি পাথর দিয়ে থেতলে থেঁতলে নরম ক'রে ফেলে তাই দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগল মেঝে।

এই বিষয়ে তার পারদর্শিতা লক্ষ্য ক'রে রঞ্জনা অবাক হলেও আমি হই নি।

'পাওয়া' যেদিন পিঠে-তীর-বেঁধা অবস্থায় নৌকোয় এসে পড়েছিল,—তার ক্ষতস্থান থেকে গলগল ক'রে বেরুনো রক্ত ভাসিয়ে দিয়েছিল নৌকোর পাটাতন,—সেই রক্তের দাগও অমনি ক'রে ঘষে ঘষে অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে উঠিয়ে ফেলেছিল আনা, সে-দৃশ্য আমার চোখে ভাসছে এখনো।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলাম আনাকে। হাঁটু মুড়ে উবু হ'য়ে বসে জল দিয়ে ছোবড়া ঘষছে কাঠের মেঝের ওপর—বিশেষ একটা রীতি আছে তার মধ্যে, আঙুলের বিশেষ চাপ! অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই,—রঞ্জনা ওর চুলে যে খোঁপা বেঁধে দিয়েছিলেন, শরীরের মুহুর্মুহুঃ আন্দোলনে সে-খোঁপা গেছে ভেঙে,—কপালে, নাসিকার অগ্রভাগে ঘামের বিন্দু উঠেছে ফুটে! ওর একাগ্র ভাব লক্ষ্য ক'রে মনে হচ্ছিল, ওর মন যেন ঘষে ঘষে ওর সমস্ত অতীতটাকেই অমন ক'রে চাইছে মুছে ফেলতে!

রঞ্জনা দেবী মুখ টিপে একটু হেসে বললেন,—নাঃ! যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা নয়। বৌ আপনার কাজের আছে।

হাসলাম আমিও, বললাম,—দিন না ওকে কাজ করতে। একাই করুক।

—আহা!—অদ্ভুতভাবে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠলেন রঞ্জনা,—একা ওকে এতটা কাজ করতে দিয়ে পুরুষের রাগ কুড়োই আর কী!

বলেই আর দাঁড়ালেন না, পিছন ফিরে চট্ ক'রে সরে গেলেন অন্য দিকে। কয়েক মুহূর্ত ওঁর দিকে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে

আমিও চলে এলাম বারান্দায়। মাঝে মাঝে সত্যি অদ্ভুত লাগে রঞ্জনা দেবীর কথার ধরণ। ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

তা' প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল ওদের সব-কিছু ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে ক'রে তুলতে।

জল-তোলা লোকটি তার হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বিদায় নেবার পর ওরা দু'জনে নেমে এলেন নিচে। আমি ততক্ষণে বারান্দা ছেড়ে দিয়ে নিচে নেমে ঘরেরই ছায়ায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে মাটিতে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিলাম।

টোম্বিকে একবার দেখলাম ছুটে আসতে এইদিকে, সম্ভবতঃ তার মায়ের কথা মনে পড়েছিল বোধ হয়। কিন্তু, কিছুদূর এসে আমার দিকে হঠাৎ-ই চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরে আর না এগিয়ে পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে,—বোধহয় তার প্রিয় জায়গা,—'ফড়া'র ঘরে।

আমি উঠে গিয়ে ওকে ধরতে পারতাম,—টেনে নিতে পারতাম কোলের কাছে, আদরে-আদরে অস্থিরও ক'রে তুলতে পারতাম। আনারই ছেলে বলে আমার সে ইচ্ছাও মাঝে মাঝে জাগত প্রবল হ'য়ে। কিন্তু না,—ও কাছে এলেই ওর নিথর দেহভঙ্গী আর ভয়ার্ত দুটি চোখের দৃষ্টি আমাকে তীব্র কশাঘাত হানবে। আমি জানি, অন্ততঃ ওর কাছে আমি কতো বড় অপরাধী। তাই, ও-ও যেমন সহজ হয় না, আমিও সহজ হ'তে পারি না ওর কাছে।

একটা কাঠবেড়ালী আশেপাশের কোন্ গাছ থেকে একবার নেমে এল, ধীরে ধীরে আমার পায়ের কাছ বরাবর এসে কেমন অদ্ভুতভাবে লেজ গুটিয়ে বসে পড়ল, দুটি ছোট ছোট কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল, জ্বলজ্বলে দুটি গোল গোল খুদে চোখ মেলে যেন চেয়ে রইল আমার দিকে কিছুক্ষণ,—ঠোঁটও নাড়ল,—মনে হ'ল, ঠিক মানুষেরই মতো যেন ঢোঁক গিলল একটা। ভঙ্গীটা

এমন হ'ল, যেন মনে হ'ল,—ঠিক এইবারই সে কথা কয়ে উঠবে একেবারে মানুষের ভাষায়,—এই, তোমরা কে হে এখানে? কী করছ?

কিন্তু, ততক্ষণে কাঠের সিঁড়িতে বেজে উঠেছে পায়ের শব্দ,—আর সঙ্গে সঙ্গেই কান দুটো খাড়া হ'য়ে উঠল তার, পরক্ষণেই লেজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়, একেবারে ঘাস পেরিয়ে গাছে উঠে ডালপালার আড়ালে।

রঞ্জনা হেসে বললেন,—কী বসে আছেন চুপচাপ? এই খুঁটি-গুলো ঘিরে এখানে রান্নাঘর তৈরি করতে হবে। উঠুন। এবার বর-বউ দু'জনকেই কাজে লাগাব।

সেই জল-তোলা লোকটি চার টুকরো বড়-বড় দরমা নিয়ে এল মাথায় ক'রে। আর কিছু বাখারী আর দড়ি। রঞ্জনা বললেন,--আসুন, তৈরি ক'রে ফেলি।

তারপরে, স্থানীয় ভাষায় সেই লোকটিকে কী যেন বললেন তিনি,—সে লোকটি মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে, তারপরে দরমা টেনে নিয়ে খুঁটিতে লাগাতে চেষ্টা করল।

বললাম,—কিন্তু এখানে রান্নাঘর ক'রে কী সুবিধা হবে? শেয়াল কুকুরে রান্নার জিনিসপত্র টেনে নিয়ে যাবে না?

মুখ টিপে আবার হাসলেন রঞ্জনা, বললেন,—অতো যদি ভয়, তো, কড়া পাহারা রাখবেন।

বলে ফেললাম,—কার ওপর?

—এই আপনার সব সম্পত্তির ওপর।

—আমার এখন সম্পত্তি বলতে যা কিছু, সবই তো পরস্মৈপদী।

চট্ ক'রে আনার দিকে একটু কটাক্ষ ক'রে বলে উঠলেন,—অন্ততঃ একটি তো নয়।

বিস্মিত চোখে আমাদের দু'জনকেই লক্ষ্য করছিল আনা। রঞ্জনা দেবীর কথায় আনার দিকে তাকাতে গিয়ে মুহূর্তে বিষণ্ণতায় ভরে

গেল মন,—এরা যে পরিচয়ই পেয়ে থাক, সত্যিই তো, ও আমার কে?

আমাকে নীরব হ'য়ে যেতে লক্ষ্য ক'রে, কৌতুকে হেসে উঠলেন রঞ্জনা দেবী, বললেন,—ব্যাপারটা কী জানেন? এ-সব জায়গার এই-ই নিয়ম। নইলে মোটা মোটা কাঠের খুঁটির মাথায় কাঠের ঘর,—এতে কখনো বাস ক'রে ছিলেন নাকি, আগে? আমার তো প্রথম প্রথম দেখে অবাক লাগত, এখন অবশ্য সয়ে গেছে।

—সয়ে আমাদেরও যাবে।

—তাই বলছিলাম, রান্নাঘর তৈরি ক'রে লোকে এখানে এমনি ক'রেই। কাজকর্ম হ'য়ে গেলে হাঁড়িকুড়ি সব আবার উঠিয়ে নিতে হয় ওপরে।

বলেই আবার হাসলেন,—ভয় নেই, এটুকু বাড়তি খাটুনীতে আপনার বউ কাহিল হ'য়ে পড়বে না। নিন, আর দেরি নয়, হাতে-হাতে কাজটা সেরে ফেলা যাক্।

তৈরি হ'ল দরমা-ঘেরা রান্নাঘর। আনার উৎসাহ দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। রঞ্জনা আনাকে একসময় ডেকে বললেন,—এই, তোর বরকে এবার ঘরে উঠে যেতে বল্। উনুন তৈরির ব্যাপারে পুরুষের আর দরকার নেই।

আনা কী বুঝল কে জানে, পায়ে-পায়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে, আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল,—বর!

পিছন থেকে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন রঞ্জনা দেবী,—আমি তাড়াতাড়ি ছ'পা সরে গিয়ে মুখ ফেরালাম অন্যদিকে,—বোধহয় লজ্জা পেয়ে আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল আনার মুখ,—সে মুখ নীচু ক'রে জড়িত পায়ে রঞ্জনা দেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে গিয়ে লুকালো মুখ।

সস্নেহে বলে উঠলেন রঞ্জনা দেবী,—থাক রে, আর লজ্জা করতে হবে না, ঐ তোর বর চলে যাচ্ছে।

ওপরে উঠে এসে বারান্দায় বসলেও আমার দৃষ্টিপথ থেকে ওঁরা ঠিক সরে যান নি। মুখ ঘুরিয়ে বারান্দা থেকে নিচে দৃক্‌পাত করলেই দেখা পাওয়া যেতে পারে। রান্নাঘরটা এ-ঘরের নিচে হ'লেও, মাটি বা জল আনার কাজে ওরা কেউ বাইরে বেরুলেই আমি নির্ঘাত দেখতে পাবো।

—বর!—সেই অদ্ভুত আধো-আধো স্বরে অস্ফুট-কণ্ঠে উচ্চারণ করা কথাটি বার বার মনের মধ্যে গুনগুন ক'রে ফিরতে লাগল।

হঠাৎ দেখি,—বাইরে কোদাল দিয়ে লোকটা যেখানে মাটি কাটছিল,—সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে আনা। লোকটা মাটি কেটে ঝুড়িভর্তি মাটি নিয়ে সামনের দিকে এসে আমার দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হ'তেই, আনা করল কী, নীচু হ'য়ে কী-একটা জিনিস মাঠ থেকে কুড়িয়ে, চকিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে, দুষ্টুমীভরা মুখে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। দিয়েই, ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল সে। ওর ছুঁড়ে-দেওয়া জিনিসটা ঠক্ ক'রে এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে,—দেখি, মাটির একটা ঢেলা।

কিছুক্ষণ পরেই এলেন সন্ন্যাসীজী নিজে। সঙ্গে টোম্বি। সঙ্গে আরও দুটি লোক। তাদের হাতে নানাবিধ জিনিসপত্র। ওঁদের দেখে, হাতের কাজ ফেলে রঞ্জনা দেবীও ছুটে এলেন, আনাকে সঙ্গে নিয়ে। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—আসুন।

হেসে বললেন সন্ন্যাসীজী,—বাজারে পাঠিয়েছিলাম লোক। অতি কষ্টে অনেক ঘুরে যোগাড় করা গেছে একজোড়া ধুতি। দেখুন তো, কেমন হ'ল ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—না না, এ-সব কী করতে গেছেন আপনি! সন্ন্যাসী মানুষ···

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—সন্ন্যাসী মানুষকে তো অন্ধ হ'য়ে থাকলে চলে না। ঘর-সংসারে থাকতে গেলে এসব তো আপনাদের দরকার। হতেন যদি আমার মতো 'ফুঙি,' এ-সবের প্রস্তাব আমি মুখেও আনতাম না।

—হ্যাঁ, আচ্ছা লোককেই 'ফুঙি' হ'তে বলেছ!—বলতে বলতে এগিয়ে এলেন রঞ্জনা দেবী, সন্ন্যাসীকে বললেন,—এসো বাবা, ভিতরে এসো, কাঠের ওপর জল শুকিয়ে গেছে এতক্ষণে, তোমরা সব বসতে পারবে।

—চলো।

আমরা সবাই ভিতরে এলাম। রঞ্জনা দেবী লোক দুটিকে স্থানীয় ভাষায় কী যেন বললেন, ওরা জিনিসপত্র সব খাটের ওপর নামিয়ে রেখে সন্ন্যাসীজীকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল।

সন্ন্যাসীর হাত ধরে তাঁরই কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টোম্বি। তার দিকে তাকিয়ে রঞ্জনা দেবী বলে উঠলেন,—টোম্বির জন্য কী এনেছ বাবা?

প্রশান্ত হাসির রেখা সন্ন্যাসীর মুখে, সস্নেহে টোম্বির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠলেন,—ওর জন্য যা এনেছি, তা তো এখানে থাকবার কথা নয়। ও থাকবে আমার কাছে।

আনা ততক্ষণে ছেলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল,—তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন রঞ্জনা,—কী রে, পারবি তো ছেলেকে ছেড়ে থাকতে? ছেলে থাকবে আমার বাবার কাছে, কখনো বা আমার কাছে।

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারে নি আনা, পরে হাত-মুখ নেড়ে রঞ্জনা দেবী যখন ইশারায় সব বুঝিয়ে দিলেন, তখন বোধহয় ধরতে পারল,—মাথা নেড়ে হাসি-হাসি মুখেই জানাল,—হ্যাঁ। তার আপত্তি নেই।

রঞ্জনা আনার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,—তা এবার

কাপড়চোপড়গুলো দেখে নে—আমার হাতজোড়া—দেখছিস না?

রঞ্জনার দুটি হাতই কাদামাটি মাখা,—হাত দুটো তিনি বুকের কাছে উঠিয়েই রেখেছেন আড়ষ্টভাবে,—আর কপালে, নিচের ঠোঁটটির পাশে দুটি মাটির বিন্দু,—শুকিয়ে আছে। মাথায়, কপালের কাছে, চূর্ণালকগুলিও মাটির ছোঁয়া লেগে ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে।

বললাম,—আনা থাক, বরং আমিই খুলছি প্যাকেট।

—থাক হয়েছে!—রঞ্জনা বললেন,—মেয়েলী কাজের দিকে পুরুষের অতো ঝোঁক কেন? যার কাজ, সে শিখে নিক। এই আনা, এদিকে আয়।

আনা যেন অনেকটা বুঝতে আরম্ভ করেছে ওঁর কথাবার্তা,—সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ওঁর কাছে।

মোড়কগুলোর কাছে গিয়ে রঞ্জনা নির্দেশ দিলেন ওকে,—এগুলোর গিঁট খোল্।

আমি পিছন থেকে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—ও কী পারবে? ও কী জানে? আমিই বরং—

—থামুন দেখি মশাই আপনি!

সন্ন্যাসীজী হেসে উঠলেন, বললেন,—আমি এবার যাই। আপনারা সবাই মিলে গুছিয়ে-টুছিয়ে নিন। আরও জিনিসপত্র আসছে, চাল-ড়াল এইসব।—দেখে নেবেন। আমি টোম্বিকে নিয়ে চললাম।

রঞ্জনা বললেন,—আজ আমরা নদীতে যাব স্নান করতে। টোম্বিকে সঙ্গে নেব কিন্তু।

—তা নিও। আপত্তি কী?

বলে উঠলাম,—কিন্তু সন্ন্যাসীজী,—এ-সব কেনাকাটা করতে তো অনেক টাকা লেগেছে,—এ টাকা—

হাসলেন উনি, বললেন,—আরও কিছু নগদ টাকা আপনাকে দেব। দরকার হবে আপনার। বেশ তো, পরে দেবেন। আমরা ভিক্ষু,—ভিক্ষা করি,—দান করার অধিকার তো আমাদের নেই!

টোম্বির হাত ধরে চলে গেলেন উনি। আশ্চর্য ওঁর ক্ষমতা! আমি যা পারি নি, উনি তা পেরেছেন। টোম্বিকে বশ করেছেন।

—এই দেখুন—রঞ্জনা বললেন,—আপনাদের বিছানা—বালিশ—মশারী-চাদর। আর ঐ হচ্ছে—আনার পোষাক। দেখুন, ঠিক বর্মী পোষাক হয়েছে কিনা। বেশ কয়েক প্রস্থ, ওর অসুবিধা হবে না।

তারপরেই মুখ টিপে একটু হেসে নিম্নকণ্ঠে বলে উঠলেন,—ভয় নেই, আপনার বর্মী বউকে শাড়ী পরিয়ে বাঙালী ক'রে তুলব না!

—এ-কথা কেন বলছেন!

—বারে, পছন্দ-করা মেয়ে আপনার! বর্মী ভাবভঙ্গী আর পোষাক-আষাক দেখেই না মুগ্ধ হয়েছিলেন!

অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে, মুখে কোন কথাই এল না কয়েক মুহূর্ত।

কণ্ঠে ঈষৎ ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন,—কী, দেখছেন কী অমন ক'রে! পুরুষের মন কিছু-কিছু বুঝি। বর্মী পোষাকে মন ভুলেছে যখন, বাঙালীর পোষাকে মন ভরবে কেন!

বলেই আর দাঁড়ালেন না, চট্ ক'রে সরে গেলেন বারান্দায়। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উচ্চকণ্ঠে বলে গেলেন,—আনাকে আর নিচে পাঠাবেন না। ওকে নিয়ে সব গুছিয়ে ফেলুন। আমি হাতের কাজটা সেরে খানিক পরেই আসছি।

বিছানার উপকরণ আর পোষাক-আষাকের স্তূপ,—এরই মধ্যে আমার দিকে দুটি স্নিগ্ধ চোখ মেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আনা। চুলের গোড়ায় একটা ফাঁস লাগিয়ে খোঁপা বাঁধা,—চূর্ণালক মাটির বর্ণে ঈষৎ বিবর্ণ,—আশ্চর্য, এতক্ষণ চোখে পড়ে নি, বাঁ চোখের ঘন পল্লবে কী ক'রে যেন ছুঁয়ে আছে সামান্য একটু মাটি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিলাম সযত্নে, ছোট্ট কপালটিতেও হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ধীরে ধীরে।

যেন আরামে অবশ হ'য়ে গেল ওর সমস্ত দেহমন, আমার বুকে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে দুটি চোখ বুজল। মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, আনা!

মুহূর্তে আমার গলা জড়িয়ে ধরল দুটি হাতে,—আমার মুখ যেন জোর ক'রে নামিয়ে আনতে চায় নিজের মুখের কাছে। আবার জাগল সেই প্রমত্ততা।

একটু হেসে বললাম,—কী? একী করলে? মরে যাবার ভয় হবে না তো? তুমি নৌকোতে বলতে—

কিন্তু, কাকে বলছি? এত কথা ও বুঝবে কেমন ক'রে!—

অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে, ইশারা-ইঙ্গিতে আবার বোঝাতে চেষ্টা করলাম কথাটা। বোধ হয় বুঝল। একটু হেসে, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলল,—বউ।

বললাম,—হ্যাঁ, বউ তো বটেই।

আমার বুকে হাত দিয়ে বলল,—বর।

—সে-ও বুঝলাম।

'না' শব্দটা বোধহয় রঞ্জনা দেবীর কাছ থেকে ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছে। নিজের বুকে হাত দিয়ে আবার বললে,—আনা, না।

—আনা, না? তবে তুমি কী?

—বউ।

—আর আমি?

সেইরকম আমার বুকে পুনর্বার হাত রেখে বলে উঠল,—পাওয়া, না।

—পাওয়া, না? কী আমি তবে?

—বর।

হেসে উঠে দুটি হাতে টেনে নিলাম ওর মুখখানা। এরপর ও যা ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝাল, তা' এই,—যেহেতু—আমরা আর জলে

নেই, ডাঙায় উঠে এসে, 'পাওয়া' আর 'আনা' না থেকে 'বর' আর 'বউ' হয়েছি, সেইহেতু—যে 'আচরণ' করলে আমাদের মরবার ভয় ছিল জলে,—এখানে আর সে ভয় নেই।

—নেই তো! বাঁচা গেল!

ওর অধরে মুদ্রিত ক'রে দিলাম প্রগাঢ় চুম্বন, বললাম, নিজের বুকে হাত দিয়ে বললাম,—টুহি?

বললে,—টুহি, না।

আশ্চর্য হ'য়ে বললাম,—আমি 'টুহি' না? কী তবে?

—বর।

—সর্বনাশ! 'বর' হ'য়ে আমার অমন স্থন্দর নামটাও মুছে গেল নাকি!

সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা মনকে ছুঁয়ে গেল মুহূর্তে। 'বর' শব্দটার সঠিক অর্থ ও বোধহয় এখনো বোঝে নি,—'বর' বোধহয় ও মনে করেছে,—আমার নাম। 'বউ' বলতে বোধহয় মনে করেছে, আমাদের-রাখা ওরই নাম।

কিন্তু, ভুল ভাঙাই কী ক'রে এখন? আর, ভাঙিয়েই বা লাভ কী? ওর মুখে 'বর' কথাটি এত চমৎকার শোনায়, যে, বলবার নয়। কেন বঞ্চিত করি নিজেকে এ পাওনাটা থেকে!

ওর শাড়ীর আঁচলটা ধরে বলে উঠলাম,—এটা ছেড়ে ফেলো দেখি? ঐ পোষাকটা পরো।

কেনা জামা ওকে কতোটা মানাবে কে জানে,—গোলাপী অর্গাণ্ডির নক্সাকাটা জামা আর গাঢ় খয়েরী রঙের সিল্কের লুঙি বার ক'রে বললাম,—ও-গুলি ছেড়ে এ-দুটো পরো।

আমার কথার তাৎপর্য বুঝে তাড়াতাড়ি আঁচলটা টেনে বুকের কাছে ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাতে লাগল,—না, শাড়ী সে ছাড়বে না। বললে,—দিদি।

বুঝলাম, 'দিদি' কথাটাও শিখেছে, রঞ্জনা দেবীকে বলতেও শুরু

করেছে দিদি। ওর ভঙ্গী দেখে বুঝলাম, ও বলতে চায়,—এ কাপড় আমাকে দিদি পরিয়ে দিয়েছে, আমি এ ছাড়বো না।

আমি ইঙ্গিতে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম,—কিন্তু, এটা যে ওঁকে ফেরত দিতে হবে।

বুঝতে পেরে, বার বার মাথা নেড়ে জানাতে লাগল,—না, ফেরত সে দেবে না।

কিন্তু, কেন? রঞ্জনা দেবীকে অনুসরণ ক'রে ওর লাভ কী? কেন ও প্রাণপণে অনুসরণ করতে চায় রঞ্জনা দেবীকে?

বার বার বলা সত্ত্বেও যখন শুনল না, তখন অদ্ভুত একটা ক্রোধ জন্মালো আমার মনে। আচ্ছা জেদী মেয়ে তো? ওর আঁচলটা জোর ক'রে টেনে ধরে বলতে লাগলাম,—ছাড়তেই হবে তোমাকে এ কাপড়! পরো, পরো শীগগির ঐ পোষাক?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেল আনা,—একটা বেদনার ছায়াও ফুটে উঠল ওর মুখে। আমি যে রাগ করতে পারি, আমার চোখে-মুখে যে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠতে পারে,—এ বোধহয় কোনদিনও ভাবতেও পারে নি। ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল শাড়ীর প্রান্ত হাতের মুঠি থেকে,—আঁচলটা লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে।

—আসতে পারি?

চমকে উঠলাম রঞ্জনা দেবীর কণ্ঠস্বরে। অপ্রতিভ হ'য়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—আরে, আসুন—আসুন।

ধীর পায়ে গম্ভীর মুখেই ঘরে ঢুকলেন রঞ্জনা দেবী, আনার দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে নিয়েই বললেন,—চান বুঝি পোষাক বদলাতে? ও কী পারে? ও কী জানে? আপনি বাইরে যান, আমি ওকে এখুনি সাজিয়ে দিচ্ছি আপনার মনের মতো ক'রে।

আমি নিরুত্তরেই বেরিয়ে আসছিলাম ঘর থেকে, উনি পিছন থেকে বলে উঠলেন,—একটু দাঁড়ান।

তারপরে কাছে এসে বললেন,—একটা কথা বলব? নদীতে নাইতে যাব এখুনি,—তারপরে এসে ওকে ওই পোষাক পরালে হবে না?

বলে উঠলাম,—নিশ্চয়—নিশ্চয়। এই সামান্য ব্যাপারটার ওপরে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

অভ্যস্ত হাসিটুকু এতক্ষণে ফুটল ওঁর মুখে, বললেন,—তাহলে ওকে নিয়ে যাই চান করাতে? আপনিও আসছেন তো?

—কী? চান করতে?

—হ্যাঁ। ভারী সুন্দর টলটলে নদীর জল—নাইতে খুব ভালো লাগবে।

—বেশ।

—তাহ'লে তৈরী হয়ে নিন। ঐ দেখুন, ওখানে তোয়ালে রয়েছে। সাবান আর তেল, আমি নিয়ে আসছি। আনাকে নিয়ে যাই?

হাসিমুখেই বললাম,—নিন্ না!

রঞ্জনা ছুটে গিয়ে আনার হাত ধরলেন—আয় রে আনা, টৌম্বিকে নিয়ে আসি চল্।

আনা বললে,—আনা, না।

একটু অবাক হ'য়েই রঞ্জনা বললেন,—তবে?

—বউ।

ওর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে রঞ্জনা বলে উঠলেন,—দূর পাগলী! 'বউ' তুই আমার কাছে হ'তে যাবি কেন? 'বউ' তুই—ওঁর!

বলে আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েই ওর হাত ধরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সিঁড়িতে শুনতে পেলাম ওদের দু'জনের সম্মিলিত কলহাস্য।

পরদিন। ভোরবেলা। বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে

দেখছি—সূর্যোদয়। কতো পাখীর কলরব যে ভেসে আসছে! নদীর বুকের ওপর পর্যন্ত এক ঝাঁক ছোট্ট পাখী উড়ে চলে গেল বলয়ের আকারে, আবার বলয়াকৃতিটি ভেঙে দিয়ে ফিরে এল তীরভূমিতে—বসলো এসে কোন সহকার শাখার ওপরে। একটুক্ষণ পরে পুনর্বার গেল তারা ঝাঁক বেঁধে নদীর বুকের দিকে, ঠিক সেইরকম বলয়ের আকার ধারণ ক'রে,—আবার ফিরে এল হঠাৎ-ই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে। এ-রকম খেলা চলল তাদের অনেকক্ষণ ধরে। তাদের মত্ততায়, সূর্যরশ্মির আলোক রেখায় ঝিরঝিরে হাওয়ায়—আর নদীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে—সে-এক অপূর্ব প্রসন্ন প্রভাত!

নদীর ঘাটে রঞ্জনা দেবী গেছেন টৌম্বিকে নিয়ে স্নান করতে, সঙ্গে আনা। আমাকে ওঁরা আজও ডেকেছিলেন, কিন্তু আমি আজ যাই নি। কী জানি কেন, যেতে মন সরলো না।

ঘোরানো কাঠের বারান্দাটার এককোণে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ওদের স্নান দেখছিলাম। আনা জলে নেমেই স্নানের উল্লাসে গেল মেতে। টৌম্বিরও খুশীর অন্ত নেই। তরতর ক'রে দ্রুতগতিতে আনার সাঁতার-কাটা,—নানান্ ভঙ্গিমায়,—দেখতে দেখতে অবাক হ'য়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে পড়েছেন রঞ্জনা। টৌম্বির উচ্ছলতা কমে এলেও, আনার উদ্দামতার শেষ নেই। একসময় দেখি, সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে এসে রঞ্জনার হাত ধরে এক ঝট্‌কা টান দিয়ে ডুব জলে নিয়ে গেল ওঁকে।

বুঝলাম, সাঁতারে রঞ্জনাও পটু, কিন্তু তা' বলে পারবেন কেন তিনি ঐ জলকন্যার সঙ্গে? কিছুটা দূর পর্যন্ত সাঁতার কেটে ফিরে এসে রীতিমত পরিশ্রান্ত বোধ করছেন যেন তিনি। আনার অবশ্য শ্রান্তির লক্ষণও নেই,—সে তখন চক্রাকারে দ্রুতগতিতে ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত এক সাঁতারের কৌশল দেখাচ্ছে। কিন্তু, কতক্ষণ? কাছে আসতেই ওর হাত ধরে কী যেন ওকে বলতে লাগলেন রঞ্জনা। পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে সম্ভবতঃ কাঠের বারান্দায় আমার উপস্থিতিকে

নির্দেশ ক'রেই কিছু তিনি বুঝিয়ে থাকবেন ওকে! মুহূর্তে যেন নিভে গেল ওর সমস্ত চঞ্চলতার বহ্নিশিখা,—ও চকিতে একবার এদিকে দৃকপাত ক'রে পরনের কাপড়চোপড় সামলাতে লাগল,—ওকে তাতে অবশ্য সাহায্য করতে লাগলেন রঞ্জনা। সন্ন্যাসীজীর 'শীলব্রত' কিন্তু ততক্ষণে স্নানপর্ব সেরে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

আমার কিন্তু দূর থেকে মনে হচ্ছিল, কোথায় একটা ছন্দপতন ঘটে গেল। সভ্য নারীর পক্ষে অমন ক'রে উদ্দামভাবে জল তোল-পাড়-ক'রে-সাঁতার দেওয়া হয়ত শোভন নয়, কিন্তু, আনার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বিকাশ দেখেছিলাম বহুদিন পরে,—তা-ও যে দুর্লভ, তা-ও যে অত্যাশ্চর্য উদ্‌ঘাটন আজকের এই সমস্যানিপীড়িত প্রাণপ্রাচুর্যবিহীন সমষ্টিগত জীবনধারার ক্ষেত্রে! আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, সেইদিনটির কথা,—যেদিন ও আর ওর 'পাওয়া' সেই ক্ষুদ্রকায় অজ্ঞাত এক দ্বীপে নেমে নারিকেল সংগ্রহ করতে গেল দু'জনে। ঢেউ কেটে কেটে অগ্রসর হওয়ার যে সাবলীল ও উল্লসিত ভঙ্গী দেখেছিলাম সেদিন,—আজ, বহুদিন পরে যেন দেখতে পেলাম,—তারই এক অনুরণন!

কিন্তু, এর পাশাপাশি আরও এক চিন্তা মনের মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল পরমুহূর্তেই। আমি ওদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যদিকে চোখ মেলেছিলাম। দেখছিলাম, ঘাটের পাশে একটা বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাতে আটকানো রয়েছে আমাদের সেই নৌকোটা। নদীর ছোট ছোট ঢেউ এসে লাগছে গায়ে,—আর দুলে দুলে উঠছে নতুন ছইয়ে-ঘেরা নৌকোটা। হালটাও দেখছি, নতুন হয়েছে। নতুন লালচে কাঠের রঙ্ এখান থেকেও চোখে পড়ে।

দেখতে দেখতে কেন যেন নিবিড় এক বেদনায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃত্যুশয্যায় শায়িত 'পাওয়া'র সেই স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি! তার সেই আঙুল কেটে রক্ত

বার ক'রে আমাদের কপালে টিকা পরিয়ে দেবার কথাটা মনে পড়তেই চোখ ছুটো ঝাপসা হ'য়ে উঠল, তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরে। একপাশে হাঁড়ির ওপরে হাঁড়ি সাজিয়ে কখন যেন একসময় ভাঁড়ার রেখে গেছেন রঞ্জনা দেবী, সেই দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

আনার মধ্যে অপরূপ প্রাণ-প্রাচুর্যের লীলা প্রত্যক্ষ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিল আমার মধ্যেকার যে-মন, সে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত হ'য়ে রইল; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে,—আমার আরেকটি মন বেড়াতে লাগল হাহাকার ক'রে। ওর 'পাওয়া'কে কি ও নিঃশেষে ভুলে গেল? ভুলতে পারা কি এতই সহজ? হায় রে, আজ যা' জেনেছি, তা' যদি জানতে পারতাম সেদিন,—তাহ'লে সেদিনকার সেই প্রভাতবেলায় অমন মর্মদাহে জ্বলে-পুড়ে মরত না আমার সেই মন!

অন্যমনস্ক চিত্তে কখন্ যে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসেছি, নিজেরই খেয়াল ছিল না,—হঠাৎ চোখে পড়ল, ভিজে হলদে লুঙিটা কোনরকমে ছু'হাতে সামলে ঘাট থেকে ফিরে আসছে টৌম্বি। কোঁকড়া-কোঁকড়া উদ্ধত চুলের রাশি ভেজা, টসটস ক'রে জল পড়ছে মাথা থেকে,—গোল গোল অথচ প্রখর ছুটি কালো চোখ—সামনে নিবদ্ধ,—আমাকে বোধহয় ও দেখতে পাচ্ছে না। কাছে আসতেই ছুটি হাত বাড়িয়ে কোমল-কণ্ঠে ডেকে উঠলাম,—টৌম্বি!

নিদারুণ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পথের ওপর,—তারপরে আমাকে দেখা মাত্রই সেই ভীত, ত্রস্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর চোখে,—ছু'পা পিছিয়ে গিয়ে অবশেষে ছুটতে লাগল সে। না, ঘাটের দিকে নয়, সোজা চলে গেল সে সন্ন্যাসীজীর ঘরের দিকে।

সন্ন্যাসীজীকে ও বিশ্বাস করে, কিন্তু আমাকে করে না কেন? কেন আসে না আমার কাছে? লক্ষ্য করেছি, আজকাল ওর

মাকেও ও যেন ভয় পায়! রঞ্জনা দেবীর কাছে তবু যায়, কিন্তু ওর মায়ের কাছে তেমন থাকতে চায় না।

যাদু জানেন অবশ্য সন্ন্যাসীজী নিজে। কী মন্ত্রে যে টৌম্বিকে তিনি আপনার ক'রে নিয়েছেন, তা তিনি নিজেই জানেন। আনারও ছেলের দিকে তেমন ঝোঁক নেই দেখেছি, সন্ন্যাসীজীর হাতে ছেলেটিকে সঁপে দিয়ে সে যেন নিশ্চিন্ত।

দৃষ্টিপথ থেকে টৌম্বি মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম সন্ন্যাসীজীর ঘরের দিকে মুখ ক'রে,—কখন্ যে ভিজে পায়ের দাগ এঁকে এঁকে আনা আর রঞ্জনা ঘাট থেকে এসে পৌঁছে গেছেন আমার কাছ বরাবর, তা' লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ চমকে উঠলাম রঞ্জনার কণ্ঠস্বরে,—ধ্যান করছেন কার?

তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাতেই হাসি হাসি মুখে সকৌতুকে বলে উঠলেন,—ধ্যানের মানুষটি তো এইখানে।

বলেই আনাকে হাত দিয়ে আমার দিকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন,—নিন, সামলান। যে-ঝাঁপান জুড়েছিল জলের মধ্যে, আমি তো ভয়ে মরি!

—কেন!

ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললেন,—পুরুষের চোখের মণি না খোয়া যায়! খোয়া গেলে আমিই দোষী হবো তো!

বলে, আর দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন মুখ ফিরিয়ে। ভিজে শাড়ীর ওপর লাল একটা গামছা জড়ানো কোমরে আর বুকে, ভিজে চুলের রাশি পিঠের ওপরে পড়ে আছে যেন নিবিড় ম[illegible]য়।

[illegible] আনা? দুটি চোখ বড় বড় ক'রে দেখছে সে [illegible] না, শুধু আমাকে, নয়, আমাকেও, রঞ্জনাকেও। কী যে [illegible] আমাদের মধ্যে, তা যেন সে ভালো ক'রে বুঝে নিতে চায়। [illegible]য়ে দেখি, ভিজে সায়া আর ব্লাউজটা লগ্ন হ'য়ে আছে

তার দেহের সঙ্গে, বুকের ওপর রঞ্জনা বোধ হয় মেলে দিয়েছেন লাল একটা ডোরাকাটা গামছা! হাতে, শাড়ীটা। সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা এলোমেলো ভাব, উদগ্র বন্যতা। প্রথম দেখাতে একটা বিতৃষ্ণার ভাবই এনে দিয়েছিল মনে, কিন্তু পরক্ষণেই ওকে দেখতে দেখতে মনে হ'ল, এই-ই ভালো, ঢের ভালো। না রইল রঞ্জনা দেবীর শালীনতা এর মধ্যে! যা আছে, তা-ই বা কম কিসে? প্রাণের সম্পদে, মমতার ঐশ্বর্যে কোথায় ও তুচ্ছ!

ওর দুটো হাত ধরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, আনা!

অপূর্ব এক খুশীর ঔজ্জ্বল্যে ভরে গেল ওর মুখ, মাথাটা হেলিয়ে হাত দুটো চট্ ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে বনহরিণীর মতোই ছুটে চলে গেল আমার কাছ থেকে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে উঠে গেল ওপরে, বারান্দার কাছে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বলে উঠল, বর!

আমারও মন খুশীর বন্যায় টলমল করছে—তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম ওপরে।

ওর জামা-কাপড়গুলোর কাছে চুপচাপ ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলাম, অবশ্য ইশারা-ইঙ্গিতেই বটে, —কী হ'ল? পরে নাও ওগুলো?

এ-ও এক রহস্য আমার কাছে! আমার সমস্ত কথা ও বুঝতে পারে না, তাই আভাসে-ইঙ্গিতেই অধিকাংশ সময় ওকে বোঝাতে হয় আমার কথা। কিন্তু, রঞ্জনা তো ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলেন না, তিনি ওর সঙ্গে কথা বলেন রীতিমত চল্‌তি বাঙলায়। সে-সব ও কিন্তু আন্দাজে-আন্দাজে ঠিক বুঝে নিতে পারে, খুব অসুবিধা হয় না!

যাই হোক, আমার প্রশ্নের উত্তরে ও যা জানালো, তা ঐ লুঙি সে পরবে না, শাড়ী চাই রঞ্জনার মতো

ধীরে ধীরে কাছে গেলাম, বললাম,—ছিঃ করে না! এই তো বেশ পোষাক তোমার

আমার কথা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই অভিমানে গাঢ় হ'য়ে এল ছুটি চোখের তারা, ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কচি মেয়ের মতো।

সত্যিই মায়া হয় ওর হাবভাব দেখলে। বললাম,—আচ্ছা, তাই হবে। আপাতত ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে না থেকে ওগুলো পরে নাও।

আমার কথা বুঝতে পেরে ও পোষাক তুলে নিয়ে এল আমার কাছে, বললে,—তুমি পরিয়ে দাও।

—পাগল নাকি! নিজে পরতে পারো না!

কণ্ঠস্বরে বোধ হয় তিরস্কারই ফুটে থাকবে, ও চকিতে ছুটি চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করল আমার চোখের ওপর, মুহূর্তে কেমন যেন একটা ভীতি ফুটে উঠল ওর চোখের কোণে, বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে পোষাক পরিবর্তন করতে লাগল ও। আমি চলে এলাম বাইরে, বারান্দায়।

কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে এল অন্য কথা, অন্য ভাব। আনা নয়,—যার মুখ মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল, সে টৌম্বি। মনে হ'ল, ওরা পারছে টৌম্বিকে আপন ক'রে কাছে টানতে, আমিই বা পারব না কেন! কেন সে আসবে না আমার কাছে, আপন হ'য়ে?

কথাটা মনে হতেই আর অপেক্ষা করলাম না আনার জন্য। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম ওঁদের ফুঙিচঙে।

'ফড়া' বা বুদ্ধদেবের ঘরে তখনো চলেছে প্রার্থনা-সভার জের, মুণ্ডিত মস্তক, হলদে কাপড় আর চাদরে-ঢাকা 'ফুঙি' বা সন্ন্যাসীদের আনাগোনা চারিদিকে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই হচ্ছে স্থানীয় লোক, বেশীর ভাগই সব অল্প বয়সী, তরুণ সন্ন্যাসীর সংখ্যাই সর্বাধিক—কিন্তু, বয়স-আন্দাজে অদ্ভুত গম্ভীর এরা, অদ্ভুত নিস্পৃহ,

অলস দৃষ্টি একবার আমাদের দিকে হয়ত বুলিয়ে যায়, হয়ত বা সামনাসামনি দেখা হ'লে, হাসিমুখে মাথা নেড়ে সাদর সম্ভাষণও জানায়, কিন্তু কখনো যেচে আলাপ করে না। অযথা কৌতূহলের প্রকাশও এদের মধ্যে কখনো দেখি নি।

এদের মধ্যে একটি লোকের সঙ্গে সামান্য একটু আলাপ হয়েছিল। রোগা, কিন্তু রীতিমত লম্বা চেহারা, নাম বলতে পারব না, নামটা আজ মনেও নেই, রঙ ফর্সা, অনেকটা চীনেদের মতো দেখতে। সন্ন্যাসীটি ঠিক ও-অঞ্চলের নয়, ওখান থেকে আরও ভিতরে, নদীপথে গেলে 'চক্‌টো' বলে একটা জায়গায় যাওয়া যায়, সন্ন্যাসীটির নিবাস ছিল শুনেছিলাম ঐ 'চক্‌টো'র কাছাকাছি এক গ্রামে।

আমি 'সন্ন্যাসী' বলে উল্লেখ করলেও সে কিন্তু নিজের পরিচয় দিয়েছিল 'ভিক্ষু' বলে। ওদের 'ফড়া'র ঘরের বারান্দার কাছে দেখা হ'ল সেই ভিক্ষুর সঙ্গে। হাতে একখানা বই, বারান্দার কাঠের রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল সে। ইংরেজীতেই প্রশ্ন করলাম, —সন্ন্যাসীজী কোথায়?

ভালো ইংরেজী জানত, সম্ভবতঃ সন্ন্যাসীজীর শিক্ষাতেই উচ্চশিক্ষিত সে, বললে,—ফড়ার ঘরে। ধ্যানে বসেছেন।

আমি ওদের পাশ কাটিয়ে রঞ্জনার ঘরের দিকে চলে গেলাম।

খুঁজতে হ'ল না, ঘরেই ছিলেন তিনি। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তিনি তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে টৌম্বির চিবুকটি ধরে সযত্নে ওর মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। ছোট্ট একটা গেঞ্জি আর হলদে রঙের লুঙি তাকে পরিয়ে দিয়েছেন রঞ্জনা।

বুঝলাম, পোষাকটাও টৌম্বির কাছে এ কয়দিনে সহজ হ'য়ে এসেছে। সম্ভবতঃ সহজ হ'য়ে এসেছে ফুঙিচঙের আর সব লোকেরা।

আমাকে দেখেই মুখ তুললেন রঞ্জনা, বললেন,—একা যে? আনা কই?

[illegible] ওঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতে গেলাম টোম্বিকে। কিন্তু আগে যা' সে করত,—অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই দু' পা পিছিয়ে গেল সে, দুটি ভয়ার্ত নিষ্প্রাণ চোখে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে—আড়ষ্ট, পাষাণ হ'য়ে গেল তার সর্বশরীর।

—কী সর্বনাশ!—তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললেন রঞ্জনা দেবী ; না ধরলে হয়ত মূর্ছিত হ'য়ে সে পড়েই যেত।

ও যেন আমার সব কিছুর জীবন্ত প্রতিবাদ! ওর বাপ চলে গেছে, ওর মাকে আমি ছিনিয়ে নিয়েছি ওর কাছ থেকে, এ যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না ঐটুকু শিশু! সমস্ত সভ্যতার বিরুদ্ধে উদ্যত একটা অভিশাপের মতোই ওর চোখের প্রখর দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়ে।

কিন্তু, আমিই বা কী করতে পারি?

রঞ্জনা দেবীর হাসি হাসি মুখখানা গাম্ভীর্যে থমথম করছে, বললেন,—আসুন, বাবার কাছে দিয়ে আসি ওকে। বাবার কাছে ও বেশ থাকে।

উনি টোম্বির হাত ধরে চলেছেন বারান্দা দিয়ে, আমি চলেছি ঠিক পিছনে পিছনে। এমনি সময়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ল আনা। চোখ কিন্তু তার আমার দিকে। বারান্দায় উঠে এসে যেই দেখল আমি রয়েছি, অমনি স্থির হ'য়ে গেল তার পা, নিশ্চিন্ত হ'ল যেন সে।

রঞ্জনা বললেন,—এই যে এসেছিস, নে বাপু, তোর ছেলে নে।

কিন্তু, টোম্বিও আসতে চায় না আনার কাছে, আনারও তেমন আগ্রহ নেই।

আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা করছি, ইতিমধ্যে সেই লম্বা চেহারার তরুণ ভিক্ষুটিকে সঙ্গে ক'রে এসে পড়লেন সন্ন্যাসীজী। সেই প্রসন্ন হাসি তাঁর মুখে, বললেন,—কী ব্যাপার!

আমি বলে উঠলাম,—টোম্বিকে আপনি নিন। আপনার হাতেই সঁপে দিলাম।

একটু হেসে বললেন,—আপনি বলবার আগেই স্বয়ং বোধিসত্ত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছেন 'শীলব্রত'কে। 'ফড়া'র প্রার্থনার সময় ও স্থির হ'য়ে আমার পাশে বসে থাকে। আমার সঙ্গও সহজে ছাড়তে চায় না। এটা তাঁর ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছে জানবেন। আপনাদের পক্ষেও এটা ভালো হয়েছে। নইলে, আপনাদের দাম্পত্য জীবনও বিঘ্নসঙ্কুল হ'য়ে উঠত! কী বলিস মা?

প্রশ্নটা রঞ্জনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না তিনি, মুখ ফিরিয়ে রইলেন অন্যদিকে, মুখে তাঁর অভাবিত গাম্ভীর্য।

সন্ন্যাসী মনে মনে কী ভাবছেন জানি না, একথা শুনে আমার চোখের পাতা উঠল ভিজে। ভাবলাম, তিন বছরের শিশু কী নিদারুণ অভিমান নীরবে বুকে বয়ে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে! এই আত্মদান, এই নিবিড় বেদনা, এ যদি আমিই না বুঝতে পারি, তো বুঝবে কে?

সন্ন্যাসী রঞ্জনারই উদ্দেশে বললেন,—হ্যাঁ মা, ওঁর জলখাবার খাওয়া হয়েছে?

—না বাবা, ওঁদের কারুরই হয় নি!

সন্ন্যাসী তাঁর শীলব্রতের হাত ধরে তাকে নিয়ে 'ফড়া'র ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন,—ও আমার সঙ্গে বসবে'খন। তুমি ওঁদের দেখ মা।

রঞ্জনা আনার হাত ধরলেন, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আসুন।

ওঁর ঘরে বসে জলখাবারের থালায় হাত দিয়ে বলে উঠলাম, —আর কতদিন অতিথি থাকব ফুণ্ডিচঙের?

—মানে!

বললাম,—আমাদের রান্না ঘর তো তৈরি হ'য়ে গেছে, এবার ওখানেই এসব কিছু হোক না।

রঞ্জনা মুখ টিপে হেসে বললেন,—তার মানে, আমার টানা-পোড়েনটা বাড়াতে চান, এই তো? আমি না হ'লে ক'রে দেবে কে আপনাদের সব?

—না না, আনা ওসব পারবে, ওর রান্নাবান্না—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—বাঙালীর ছেলের ঐসব বর্মী খাদ্য আর মুখে দিয়ে কাজ নেই! মাগো!

—তাহলে, ওকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে নিন।

—হ্যাঁ, আমি চিরজীবনের জন্য ঐ করি আর কী! আনারই মাষ্টার হ'য়ে দিন কাটাই! কী রে, আনা?

আনা ততক্ষণে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, দুটি নিষ্পাপ বড় বড় চোখ মেলে।

রঞ্জনা হঠাৎই কথার সুর পরিবর্তন করলেন, বললেন,—আপনাকে একটা কথা বলব। টোম্বিকে 'ফুঙি' করবেন নাকি সত্যি সত্যি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম,—উপায় কী!

—কাজটা ভালো হ'ল কি না ভেবে দেখবেন। ওর মা একদিন হয়ত ওরই জন্যে আপনার ওপর—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—বিরূপ হ'য়ে উঠবে! মনে তো হয় না। ছেলের দিকে একটুও নজর আছে ওর! আপনার কাছে বলতে দ্বিধা নেই যত নজর আমার দিকে।

দিন কাটতে লাগল। টোম্বি সত্যিই 'শীলব্রত' হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের ঘরে আসেই না বলতে গেলে। সন্ন্যাসীজীরই সে চোখের মণি।

কিন্তু আনার ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। কেমন যেন হ'য়ে গেছে

ও। হাসিতে খুশীতে ভেঙে পড়ছে তরুণী মেয়ে, টৌম্বির কথা সে গ্রাহ্যেও আনে না, টৌম্বি যেন তার কেউ নয়। একদিন কাছে ডেকে নিয়ে আনাকে বললাম—টৌম্বি ?

বললে,—ফড়া।

বলেই ফুঙিচঙের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। 'ফড়া' অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধদেবের পূজা করছে সে! নিদারুণ আগ্রহে সব-কিছুই শিখছে আনা রঞ্জনার কাছ থেকে। রঞ্জনার দেওয়া হু'তিনটি শাড়ীই তার প্রিয় পরিধান। এ নিয়ে রাগ করলে চোখ ছলছল ক'রে আসে তার। অবশ্য, অদ্ভুত মানায় ওকে শাড়ী পরলে। দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাইরে, ঘরের নিচের মাঠে যখন এটা-ওটা কাজের ব্যস্ততায় ঘুরে বেড়ায়, তখন এক-একদিন ওকেই রঞ্জনা দেবী বলে বিভ্রম ঘটে যায় আমার।

ও যেন প্রাণপণে চেষ্টা করছে রঞ্জনার ছায়া হ'য়ে ওঠবার।

কিন্তু, কেন ?

একদিন, বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, ও ঘরের বারান্দার এক কোণে মুখ ফিরিয়ে আছে দাঁড়িয়ে। হলদে ডুরে একটা শাড়ী পরনে, এলো চুলের গোছাটা কাঁধের পাশ দিয়ে বুকের ওপর টেনে নিয়ে আসা, চমকে ডাকলাম,—কখন এলেন রঞ্জনা দেবী ?

চকিতে মুখ ফেরালো আনা, মুখ টিপে টিপে রঞ্জনারই মতো হাসতে হাসতে বললে,—রঞ্জনা না, আনা।

আর একদিন। নিচে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে সে ছুটে এল শাড়ার আঁচলটা লুটাতে লুটাতে। বললে,—ভাত।

বুঝলাম। অর্থাৎ, আমি কেমন ভাত রাঁধতে শিখেছি দেখ।

নিচে, রান্নাঘরে দেখতে হ'ল। দেখি, মাটির হাঁড়িতে ভাতের ফেন গেলে দিয়ে রঞ্জনা দেবীই হাসিমুখে বসে আছেন উনুনের পাশে। বললেন,—আপনার বৌকে রান্নাবান্না শেখাতে শেখাতে আমার প্রাণ গেল।

—শুধুই কি রান্না-বান্না?

—তবে?

বললাম,—ভাষাও তো শিখিয়েছেন অনেক।

নীরবে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন রঞ্জনা দেবী।

জ্যোৎস্নার প্লাবন যেন ডেকেছিল সেদিন রাত্রে! বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিলাম চুপচাপ। আনাকে রঞ্জনা দেবীই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন 'মাস্কি পয়েণ্ট'-এ বেড়াবার জন্য, বলেছিলেন,—মুখপুড়ি এক তিলও আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। আমি ওকে নিয়ে চললাম, বুঝলেন? শিগ্‌গিরই ফিরিয়ে দিয়ে যাব অবশ্য।

আনা ছাড়া পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল বাড়িতে। কোথায় গেল ওর মুখের 'টুহি' ডাক, কোথায় গেল 'পাওয়া' বলে ডাকা, ও আমাকে রঞ্জনা দেবীর শেখানো কথা,—'বর বর' ক'রে অস্থির ক'রে তুলেছে।

কাছে এসে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে চুপচাপ মেঝের ওপর বসে রইল কিছুক্ষণ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকলাম,—আনা?

—উঁ?

—কী দেখছ অমন ক'রে?

—চাঁদ।

আঙুল দিয়ে নদীর স্রোতের দিকে নির্দেশ করলাম, বললাম, —যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে সবেগে উঠে দাঁড়াল, আমার আরও কাছে এসে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর মুখ রেখে বার বার বলতে লাগল,—না—না—না!

দু'হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরলাম। অদ্ভুত দুটি চোখের

বিহ্বল দৃষ্টি ! না, ভুল নয়। ছলনা এ নয়, মোহও নয়, ছুটি চোখে ভালবাসারই ছুটি স্নিগ্ধ প্রদীপ ! এমনভাবে ভালবাসল ও আমাকে কেমন ক'রে ?

দেখেছি ওর নিজেকে প্রস্তুত করার সাধনা। পোষাক পরা ওর অভ্যাস ছিল না, তাই পোষাক পরে নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করত ও প্রথম প্রথম। কিন্তু ভালবাসার সাধনা দিয়ে সবই ও জয় করেছে। গৃহস্থালীর কাজ শিখছে, কথাও শিখছে প্রাণপণে।

—আনা ?

—উঁ ?

কী যেন আরও বলতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ বারান্দার কোণে তাকিয়ে দেখি, স্তব্ধ পাষাণখণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে আছেন রঞ্জনা দেবী ! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম,—কী আশ্চর্য ! আরে, আসুন—আসুন।

একটু অপ্রস্তুতের মতো বলে উঠলেন,—না, যাই।

—সেকি, এলেন যখন, যাবেন কেন ?

—দেখতে এসেছিলাম, আনা কী করছে। যাই, কেমন ?

বলে সত্যিই আর দাঁড়ালেন না, ছুটে নেমে গেলেন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে।

পরের দিন। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এদিক-ওদিক। ডান পায়ের হাঁটুটাতে বোধ হয় একটা চোট লেগেছিল নৌকাডুবির সময়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছিল এ কয়দিন। আজ দেখি ব্যথাটা আর নেই ! মাঙ্কি পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখে ফিরে এসেছি একেবারে টিলার ওপরে, ফুডিচঙে। 'ফড়া'র ঘরে ঢুকে দেখি, পূজা আর প্রার্থনা শেষ হ'য়ে গেছে, সবাই চলে গেছে যে যার কাজে, শুধু আসনের সামনে চুপচাপ বসে আছে—তিন বছরের শিশু,—টৌম্বি,—সন্ন্যাসীজীর ভাষায়, শীলব্রত।

ভিক্ষুরা যেমন ক'রে সোজা হ'য়ে বসে থাকেন 'ফড়া'র সামনে, ঠিক তেমনি সে বসে আছে, চোখ দুটি বোজা। কী ও বোঝে সন্ন্যাসের, কী ও বোঝে ভগবান বুদ্ধের, কী ও বোঝে মন্ত্রতন্ত্রের,—তবু, অদ্ভুত এক মনের জোর নিয়ে ঐটুকু শিশু নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায় এই সবের মধ্যে, মায়ের কাছ থেকে দুরন্ত অভিমানবশেই নিজেকে দূরে রাখতে চায় একেবারে!

আমার আর ওর মায়ের সম্পর্কে ঐটুকু দুধের শিশু কী বুঝেছে, কে জানে—কাছে আসতে চায় না, আসবার বায়নাও ধরে না, ওর একমাত্র অবলম্বন এখন সন্ন্যাসীজী। শুনেছি, রাত্রে আজকাল রঞ্জনা দেবীর কাছেও শোয় না, শোয় স্বয়ং সন্ন্যাসীর কাছে।

সন্ন্যাসীজী সত্যিই কি যাদু জানেন? 'ফড়া'র ঘর পার হ'য়ে সন্ন্যাসীজীর ঘরের দিকে যাচ্ছি, বারান্দার ওপরেই দেখা হ'য়ে গেল রঞ্জনা দেবীর সঙ্গে। কালো পাড়ের সাদা জমির একটা তসরের শাড়ী পরেছেন স্নানের পরে, কাঁধের একপাশ দিয়ে খোলা ভিজে চুলের একটি গুচ্ছ নেমে এসেছে বুকের ওপরে! আমাকে দেখে একটু হাসলেন, বললেন,—বাবার সঙ্গে দেখা করতে বুঝি?

কী আর বলি? একটা কিছু তো বলতে হবে? তাই বলে ফেললাম,—হ্যাঁ।

—তবে আসুন। আমিও বাবার ঘরে যাচ্ছি।

অজ্ঞান অবস্থায় যে-ঘরে আমার প্রথম-প্রথম কেটেছিল, সেটাই সন্ন্যাসীজীর ঘর। আমাদের দেখে সাগ্রহে বলে উঠলেন—আরে, আসুন—আসুন! বসুন।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়লাম, বললাম,—হেড্-কোয়ার্টার্সে চিঠি দিয়েছি কাল।

একটুক্ষণ থেমে তারপরে বললেন,—সে-জন্যে আমি ব্যস্ত নই। যদিও আপনি খুব ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি। রীতিমত 'হোম-সীক' হ'য়ে পড়েছেন।

সন্ন্যাসীজীর পিছনেই এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন রঞ্জনা দেবী, বলে উঠলেন,—কিন্তু ঘর-গৃহস্থালী তো আমরা পেতে দিয়েছি বাবা, বউও আছে সঙ্গে, ভদ্রলোকের অভাবটা কীসের ?

এ-কথায় হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন সন্ন্যাসীজী, বললেন,—কার যে কোথায় কীসের অভাব থাকে, তা কি কেউ বলতে পারে মা ?

কণ্ঠে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা এনে বলে উঠলেন রঞ্জনা দেবী,—তা তুমি যাই বলো বাবা, আনা যে ওঁর সব কিছু ভরিয়ে রেখেছে, এটা বুঝতে বাইরের লোকেরও ভুল হয় না। অদ্ভুত মেয়ে! নিজের সব কিছু ছেড়ে, নিজের সব কিছু ভুলে, কী ক'রে নিজেকে ওঁর মনের মতো ক'রে গড়ে তুলবে, এই ওর একমাত্র লক্ষ্য! সাধনাও বলতে পারি! এমনটি দেখা যায় না।

কী যেন আমি বলতে গিয়েছিলাম উত্তরে, বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—তোমরা বসো বাবা, আমি তোমাদের জন্য শরবত ক'রে নিয়ে আসি।

চলে যেতেই সন্ন্যাসীজী বললেন,—মূর্তিমতী সেবা। এত কাজের মেয়ে, এত স্নেহপ্রবণ মেয়ে, আমি আর দেখি নি। কিন্তু বড় দুঃখী ও।

—কী বলছেন আপনি!

—হ্যাঁ। বছর দুই হ'ল আমার কাছে ও আছে। কলকাতাতেই বুঝি বাড়ি ছিল। মা আর মেয়ে। মা মারা গেল বসন্তে, মেয়ে অসহায় হ'য়ে পড়ল। একখানা বাড়িই বুঝি সম্বল, আর কিছু নেই। শেষে কু-লোকের প্রলোভনে পড়ে দেশত্যাগী হয়। ঢাকা, ময়মনসিং, গৌহাটি, কক্সবাজার, নানান্ জায়গায় ঘুরে শেষে পালিয়ে আসে কোনক্রমে আকিয়াবে। আমার কাছে যতদিন আছে, ততদিন ভয় নেই। কিন্তু তারপর ?

আমি কিছু বলার আগেই প্রবেশ করলেন রঞ্জনা দেবী, দু'হাতে দু' গ্লাস শরবত।

ফেরার পথে রঞ্জনা দেবী বললেন,—এবার তো ভালো হ'য়ে গেছেন। ঘুরে-টুরে একটু বেড়ান। কত বেড়াবার জায়গা আছে!

—আছে নাকি?

—ওমা, নেই? যান না আনাকে নিয়ে।

বলে ফেললাম,—কিন্তু আনা যাঁর ছায়া তিনি সঙ্গে না গেলে বেড়িয়ে সুখ নেই।

অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—ভেবেছেন কী আপনি? আনার সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই কি আমাকে থাকতে হবে নাকি?

আমি নিরুত্তরে চুপচাপ রইলাম লক্ষ্য ক'রে অবশেষে বলে উঠলেন,—পুরুষের কী রাগ! আচ্ছা, যাব,—যাব। হ'ল তো? এখান থেকে স্টীমারে চড়ে 'চক্‌টো'। তা ঘণ্টা দশেক লাগবে চক্‌টো যেতে।

—কেন, সেখানে কী?

—সেখানে কিছুই না। সেখানেও বৌদ্ধ-বিহার আছে। সেই বিহারে থেকে পরদিন ভোরবেলা আবার স্টীমার ধরব। তা পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা একটার কম নয়।

বললাম,—কিন্তু, গন্তব্য স্থানটা কোথায়?

—আরাকানের পুরানো রাজধানী 'মেহং'। লোকে বলে,—পাথরী কিল্লা। দেখবার মতো।

॥ ৭ ॥

'মেহং' দেখবার অভিযানে স্বয়ং সন্ন্যাসীজী আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁর শীলব্রতও ছিল তাঁর সঙ্গে। আমি, আনা আর রঞ্জনা দেবী ছাড়াও দু'তিনজন ভিক্ষু ছিলেন সঙ্গে। সঙ্গে ছিল সেই লম্বা চেহারার তরুণ ভিক্ষুটিও। আশি হাজারী মন্দিরে আশি নব্বই হাজারটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আর একটি মন্দিরে

ছিল হাজার বুদ্ধমূর্তি। অর্থাৎ, 'মেহং'-এর সর্বত্র জুড়ে অসংখ্য মন্দির, আর বুদ্ধমূর্তি!

দু'দিন পরে 'মেহং' থেকে ফিরে এসে অদ্ভুত এক ভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম আনার মধ্যে। 'মেহং' যাত্রার মধ্যে দু'একবার ছাড়া টোম্বিকে ও ধরে নি, সবসময়ই আমার কাছে কাছে পাশে পাশে ও ঘুরেছে। রঞ্জনা দেবী বিশেষ কাছে আসতেন না তখন, সন্ন্যাসীর পাশে পাশে থাকতেন—কিন্তু যে কয়েকবার মূর্তি আর মন্দির সম্পর্কে কিছু বোঝাতে এসেছিলেন, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম, কোন না কোন ছুতোয় আনা সরে গেছে দূরে।

কিন্তু কেন? কী হ'ল আনার মধ্যে? এমনটি তো কখনো ওকে করতে দেখি নি!

সে আজ বহুদিনের কথা, তবু মনে আছে—'মেহং'-এর সেই নির্জন প্রস্তরপুরীতে ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন মূর্তি দেখে বেড়াচ্ছি,—সেই বিশাল স্তব্ধ বুদ্ধমূর্তির গাম্ভীর্য আমাদেরও নীরব ক'রে দিয়েছে, বিশেষ ক'রে,—একটি মূর্তি! মুখের পাশটি ক্ষয়ে গেছে, খসে গেছে দেহের অর্ধাংশ,—তবু ডানহাতের সেই অভয় মুদ্রা, আর অধর প্রান্তের সেই ক্ষমাশীল প্রশান্ত হাসিটুকু মুছে যায় নি!

ভুলে গেলাম সমস্ত কিছু, ভুলে গেলাম পারিপার্শ্বিক অবস্থা,—মহাকালের প্রহার থেকে বেঁচে থাকা অজানা শিল্পীর সেই অপরূপ সৃষ্টি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছি,—হঠাৎ বামবাহুমূলে কার মৃদু স্পর্শ অনুভব ক'রে চমকে উঠ্‌লাম।

দেখি, সমস্ত দলটি কখন গেছে এগিয়ে,—ধারে-কাছে আর কেউ নেই,—শুধু ভীরু কপোতীর মতো আমার বাহু অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,—আনা।

মুহূর্তে ফিরে এলাম বর্তমানের ভূমিতটে,—স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,—কী হয়েছে? ভয় পেয়েছ?

সত্যিই অদ্ভুত ভয়ার্ত ওর দুটি চোখের তারা, আমার ভাষা সঠিক

—উঁ?

বলেছিলাম,—তোমাকে ছেড়ে আমিও থাকতে পারব না কোনদিন!

কতটা বুঝেছিল কে জানে, মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল স্নিগ্ধ হাসিতে,—তারপরে, আমার আহ্বানে চলতে লাগল আমার পাশেপাশে।

আর উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটে নি। 'মেহং' দেখা আমাদের সাঙ্গ হ'ল।

পথে আসতে আসতে মোটর বোটে সেই তরুণ ভিক্ষুটির সঙ্গে আলাপ করতে করতে আসছিলাম। সন্ন্যাসীজী টোম্বিকে নিয়ে রয়েছেন একপ্রান্তে। রঞ্জনা দেবী রয়েছেন আনাকে নিয়ে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ঘেরা জায়গাটায়। আমি আর অন্যান্য ভিক্ষুরা অন্যদিকে। একথা-সেকথার পর তরুণ ভিক্ষুটি বললে,—সন্ন্যাসীজীর উদ্দেশ্য অনেক বড়। খৃষ্টানদের যেমন মিশনারী আছে, যারা পৃথিবীর নানান্ দিকে ছুটে যায় ধর্ম-প্রচার করতে,—আমরাও তেমনি হ'য়ে উঠব বৌদ্ধ মিশনারী। ভগবান বুদ্ধের অহিংসাব্রত দিকে দিকে প্রচার করব।

সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে, বললাম,—খুবই ভালো কথা।

তরুণটি উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগল,—আমি কিন্তু শীগ্‌গিরই রওনা হবো।

—কোথায়!

বললে,—বর্মার নিচে কতগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন অ্যাইল্যাণ্ড্‌স্ আছে, ম্যাপ দেখলে বুঝতে পারবেন। ওরা নাম দিয়েছে মাগু´ই অ্যাইল্যাণ্ড্‌স্!

এবার উৎসাহিত হলাম আমি, বললাম,—তারপর!

না বুঝলেও ভাবে বুঝে ছিল নিশ্চয়ই,—কেমন ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল আমার চোখের দিকে। বুদ্ধমূর্তির দিকে নির্দেশ ক'রে বললাম,—ফড়া।

হঠাৎ ও করল কী, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে নিবিড় ক'রে—কী যেন বলেও উঠল অস্ফুট কণ্ঠে। যেন বলতে চায়,—বড্ড ভয় করছে,—ফড়া যদি তোমাকে নিয়ে নেয়!

কিন্তু, আজ বুঝতে পারছি, সেদিন হয়েছিল আমার বোঝার ভুল। ও 'ফড়া'র কথা বলতে চায় নি, বলতে চায় নি, বৌদ্ধধর্ম আমাকে যেন গ্রাস না করে, আমি যেন সন্ন্যাসী না হ'য়ে যাই।—

ও বলতে চেয়েছিল বোধহয় অন্য কথা,—বলতে চেয়েছিল,—'আমার কাছ থেকে অন্য কেউ যেন কেড়ে না নেয় তোমাকে!'

আমি বুঝি নি। আমি সন্ত্রস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম,—আঃ! কী করছ, ছাড়ো—ছাড়ো—কেউ যদি···

বলতে-না-বলতেই তাকিয়ে দেখি,—মূর্তিটির ঠিক পিছন দিকেই, সম্ভবতঃ আমাদেরই খোঁজে, এসে দাঁড়িয়েছেন রঞ্জনা দেবী। মুখখানা পাংশুবর্ণ, দুটি নিষ্পলক, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন তিনি, তাড়াতাড়ি স'রে গেলেন দৃষ্টিপথ থেকে।

আনা কিন্তু তখনো আমাকে ছাড়ে নি। ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলাম,—চলো।

ও কিন্তু নড়তে চায় না, আরও কী যেন বলতে চায় আমাকে।

সে-স্নিগ্ধ, প্রগাঢ় দৃষ্টি আজও ভুলতে পারি·নি। মনে হয়েছিল,—এত ভালবাসা! এত ভালবাসার সম্পদ থাকতে পারে এক নারীর মধ্যে!

চারিদিক নির্জন। কোথায় যেন একটা পাখী ডেকে চলেছে শান্ত স্বরে। একটু হেসে ওকে টেনে নিলাম কাছে, বললাম,—আনা?

তরুণ ভিক্ষুটি বললে,—ঐ সব দ্বীপে থাকে অসভ্য আদিবাসীর দল। তাদের কাছে যাব। খৃষ্টান মিশনারীরা যাবার চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে। কিন্তু, তার আগেই আমাদের যেতে হবে।

—রাজনৈতিক কোন অসুবিধা নেই ?

—না, তা হবে না। আমাদের মনাষ্টরী হচ্ছে বর্মা গভর্নমেণ্টের অধিকারে। বর্মা গভর্নমেণ্ট এ-বিষয়ে খুব উৎসাহী !

বললাম,—জানেন কিছু ঐ আদিবাসীদের সম্বন্ধে ?

—না, তেমন কিছু না। তবে, সন্ন্যাসীজী জানেন। শুনেছি, কিছু কিছু 'ক্যানিবল্‌স্‌' আছে। আর কিছু আছে তারা অবশ্য 'ক্যানিবল্‌স্‌' নয়—একেবারে নিরাবরণ, সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় নৌকো নিয়ে। মাটিতে তারা বেশী থাকে না, জলে-জলেই জীবন কাটে তাদের,—এ-দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপ তারা ঘুরে বেড়ায় ছোট্ট নৌকো নিয়ে। ঐ যে নৌকো আপনারা এনেছেন, অনেকটা ঐরকম নৌকো হবে বলে আমাদের ধারণা।

বুকের ভিতরটা তুরতুর করছিল। যেন শব্দ পাচ্ছিলাম নিজেরই হৃৎপিণ্ডের।

বলে উঠলাম,—আচ্ছা, ওদের যদি আপনারা ধরতে পারেন, কী করেন তাহলে ?

—বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেই।

বললাম,—রেখে দেবেন আপনাদের মনাষ্টরীতে ?

—না। সন্ন্যাসীজী তা' চান না। ওঁদের আবাসভূমিতেই ওদের ফিরিয়ে দেবো আমরা। কিন্তু, ওদের ধরার কথা কী বলছেন ? ওদের ধরা সহজ নয়। সমুদ্রের ওরা যেন সন্তান। কীভাবে, কেমন ক'রে ঢেউয়ের আড়ালে আড়ালে ওরা যে দ্রুত-গতিতে আপনার চোখের বাইরে চলে যাবে, সে আপনি বুঝতেও পারবেন না।

বললাম,—আচ্ছা, কী ওদের শেখাবেন আপনি, ওদের দেশে—ওদের মধ্যে গিয়ে ?

তরুণটি বললে,—শেখাবো,—তোমরা হিংসা ক'রো না—প্রাণী বধ ক'রো না—মানুষকে ভালবাসতে শেখো—ক্ষমা করতে শেখো—সেবা করতে শেখো।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলাম। সমস্তটা পথ আর কথা বলতেও ইচ্ছা করেনি। শুধু চোখের সামনে ভাসছিল,—'পাওয়া'র সেই মুখখানা। যে আমাকে হিংসা করেনি—বধও করেনি। যে আমাকে ভালবেসেছিল,—ক্ষমা করেছিল আমাদের সমস্ত অপরাধের,—যে প্রাণ দিয়েও আমার সেবা ক'রে গিয়েছিল।

হু-হু হাওয়া দিচ্ছে সে রাত্রে। বাইরে ঘনঘোর অন্ধকার। ঠিক ঝড় নয়, তবে ঝড়ের পূর্বাভাস বটে। দুটি হাত বাড়িয়ে ডাকলাম,—আনা ?

কাছে এসে আগের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে আগের মতোই বললে—বর !

বললাম,—কেমন লাগছে এই জায়গাটা ?

—ভালো।

—ফড়া দেখলে ?

—হুঁ। কতো ফড়া !

'মেহং'-এ দেখা অসংখ্য বুদ্ধমূর্তির কথাই ও বলছে। বললাম,—এবার শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হ'ল।

হয়ত সব কথা ও বলতে পারে না, কিন্তু অনেক কথাই আমার বুঝতে পারে আজকাল। আমার বুকের ওপর একখানা হাত রেখে গাটা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। আর, বাইরে তখন প্রমত্ত বাতাস গর্জন ক'রে চলেছে !

পরের দুটো দিনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। বৃষ্টির মধ্যে মাথায় টোকা দিয়ে এরই মধ্যে এসেছিলেন রঞ্জনা দেবী, বললেন,—মায়ের কাছে আসবার জন্য বায়না ধরেছিল শীলব্রত। যেই বললাম,—চল আমার সঙ্গে, আমি যাচ্ছি!—অমনি, দু'পা এগিয়ে এসেও আবার পিছিয়ে গেল। কিছুতেই এল না।... কিন্তু, কী করেছেন আপনারা ছুটিতে? কী রে, আনা?

আনা হাসি-হাসি মুখে ছুটে গেল ওঁর কাছে, ওকে যেমন দেখলেই জড়িয়ে ধরে, তেমনি ধরেই টুক্ ক'রে একটা চুমু খেয়ে ফেলল ওঁর কপালে। সঙ্গে সঙ্গেই আরক্ত হয়ে উঠল ওঁর সমস্ত মুখখানা, আনার দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন,—দূর, অসভ্য!

তারপরেই আমাকে দেখিয়ে আনাকে বললেন,—রয়েছে না?

পরমুহূর্তে যেন সমস্ত লজ্জা আর সঙ্কোচ দূর করতেই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন আমার দিকে, বললেন,—এমন বউ নিয়ে বিপদে পড়বেন কিন্তু। এ আপনাকেও ছেড়ে থাকতে পারে না, আমাকেও ছেড়ে থাকতে পারে না।

একটু হেসে বললাম,—সেটা বুঝেছেন বলে ধন্যবাদ। ও সত্যিই আপনাকে ছাড়তে পারবে না।

—তাহলে?

কৌতুকের স্বরেই বললাম,—অতএব, যদি কলকাতা যাই, আপনিও সঙ্গে যাচ্ছেন।

—যাচ্ছি নাকি!

—তাই তো মনে হয়।

হেসে উঠলেন এবারে। বললেন,—সে-সব তো খুব হ'ল। এখন, রান্নার কী হ'ল? হাঁরে, আনা?

আনা ঠোঁট উল্টে জানালো, কিছুই হয় নি।

—বৃষ্টিতে তোর রান্নাঘর যে ভেসে গেছে! দেখিস নি?

আনা বললে,—না।

হেসে বললেন,—ভালো গিন্নী দেখতে পাচ্ছি। এমন গিন্নী নিয়ে মহাশয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে কিন্তু। এই আনা, কত্তাকে নিয়ে চল, আমার ওখানে দুটি খাবি। আয়।

সেদিন রাত্রে ঝড় থেমে গিয়ে পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে আকাশ। আনাকে বারান্দায় টেনে নিয়ে গিয়ে কালাডোন নদীর ঘাটের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলাম,—দেখেছ?

—কী?

—আমাদের সেই নৌকোটা। ঝড়ে একটুও টলে নি। কেমন শক্ত লগির আশ্রয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসছে!

সেইদিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তারপরেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে টেনে নিয়ে এলাম ভিতরে।

কিন্তু, কী আশ্চর্য! বাড়তে লাগল রাত, নিশুতি হ'য়ে গেল চারিদিক, ওর চোখে নেমে এল না ঘুম। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ডাকলাম,—আনা?

রঞ্জনা দেবীর দেওয়া সেই হলদে শাড়িটাই আজ ওর পরনে, আঁচলটা বুকের ওপরে ভালো ক'রে টেনে আস্তে আস্তে উঠে বসল। অবাক হ'য়ে বললাম,—একী! উঠলে যে! ঘুমোবে না?

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললে,—না।

তারপরেই, সেইভাবে বসে আমার মুখখানা দু'হাতে টেনে নিল কোলের ওপরে।

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল। আমার মুখের দিকে। পার হ'তে লাগল কত দণ্ড, কত পল, কত অনুপল, কে জানে!

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, দুটি চোখের কোণ বেয়ে দুটি ধারা নেমে এল, কাঁপতে লাগল ওর ঠোঁট দুটি। বললাম, একী! তুমি কাঁদছ?

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল আমার বুকের ওপরে, বলতে লাগল,—বর—বর! আমার বর!

তাড়াতাড়ি উঠে ওকে বুকে টেনে নিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিলাম ওর চোখের জল।

কিন্তু, কেন যে সে-রাত্রে অমন ক'রে ও কেঁদে উঠেছিল, তা যদি তখন বুঝতাম, তো আমার জীবনের ইতিহাস হ'ত অন্য রূপ।

ভোরের দিকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। প্রগাঢ় নিদ্রা। ঘুম ভাঙল রঞ্জনা দেবীরই চিৎকারে। বললে,—ঘুমোচ্ছেন! শীলভদ্র কোথায় জানেন? বাবা পাগলের মতো খুঁজছেন তাকে!

শীলভদ্র! মানে, টোম্বি? তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। কোথায় গেল টোম্বি?

শুধু টোম্বি নয়, আনাও নেই।

আমার বিছানার পাশটি শূন্য। ঘরের কোণে রঞ্জনা দেবীর দেওয়া হলদে শাড়িটা পড়ে আছে, পড়ে আছে রঞ্জনা দেবীরই দেওয়া সায়া আর ব্লাউজ। রঞ্জনা দেবীর হাতে শীলভদ্রের ছোট্ট লুঙি, গেঞ্জি, আর জামা। এ-ও পড়েছিল সন্ন্যাসীজীর ঘরের বারান্দায়।

তাড়াতাড়ি দু'জনে ছুটে গেলাম কালাডোন নদীর ঘাটে। যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই। শূন্য বাঁশের খুঁটিটা জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বাঁধা নৌকোটা নেই।

কালাডোন নদীর মোহানার দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই। ছুটে টিলার মাথায় এলাম—ফুঙিচঙে। বিস্তৃত সমুদ্রের বুকে কোথায় যে একটি কৃষ্ণবিন্দু মিলিয়ে গেছে, তা দেখবার মতো শক্তি এ-দুটি চোখে ভগবান দেন নি।

আমার অবস্থা দেখে আমার একটা হাত বোধ হয় চেপে

ধরেছিলেন রঞ্জনা দেবী, তাঁকে বলে উঠলাম,—আপনি শুধু বলুন, সমুদ্র এখন শান্ত, সমুদ্রে এখন ঝড় নেই!

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—না।

সারাটি দিন বোধিসত্ত্বের আসনের সামনে বসে শুধু নীরবে প্রার্থনাই ক'রে চললেন সন্ন্যাসীজী। সন্ধ্যার পর ওঁর ঘরে ওঁর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন রঞ্জনা দেবী। ভারী গলায় সন্ন্যাসীজী বললেন,—বসুন।

কয়েকটা মুহূর্ত সুকঠিন নীরবতার মধ্য দিয়ে পার হ'য়ে যাবার পর বলে উঠলাম, আমি আপনাদের কাছে একটা মিথ্যাচরণ করেছি। ক্ষমা করবেন। আনা আমার স্ত্রী নয়।

চমকে উঠলেন রঞ্জনা দেবী, সন্ন্যাসীজীও বোধ হয় একটু অবাক হলেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না।

বললাম,—না, ও আমার স্ত্রী নয়। আর, আমরা জাহাজডুবি হ'য়েও আপনাদের কূলে ভেসে আসি নি।

উত্তরোত্তর অবাক হবার পালা এবার ওঁদের। বললাম,—আনা বর্মীও নয়। তবে শুনুন আমার কাহিনী।

সব শোনবার পর যেন বুদ্ধমূর্তির মতোই স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন সন্ন্যাসীজী। শুধু, রঞ্জনা দেবীর দিকে তাকিয়ে দেখি, দুটি চোখ তাঁর জলে গেছে ভরে, কিন্তু তা গোপন করার কথাটাও ভুলে গেছেন তিনি সেই মুহূর্তে।

সন্ন্যাসীজী বললেন,—এই যে আদিবাসীদের কথা আপনি বললেন, এদের কথা আমি শুনেছি, এরা 'ক্যানিবল্‌স্‌' নয়, এরা নিরীহ। এদের বলা হয়,—'সালোন'। মাগু´ই দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে এরা থাকে।

বললাম,—আপনার কাছে আমার কতগুলি প্রশ্ন আছে।

—বলুন।

বললাম,—সবই তো শুনলেন। প্রথম প্রশ্ন—'পাওয়া' আমাকে বাঁচিয়েছিল কেন?

একটু হেসে বললেন,—এরা নিরাবরণ থাকে, এরা অসভ্য, তাই, হৃদয় বলে বস্তুটা এরা হারায় নি। সব কিছুর থেকেও হৃদয়বত্তা এদের কাছে বড়, এটা তো বুঝতে আপনার বাকি নেই?

—না।

বলেই তাড়াতাড়ি এলাম পরবর্তী প্রশ্নে,—আমি ছইয়ের মধ্যে শুয়ে আছি। নিজে পাটাতনের ওপর শুয়ে থেকে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিত কেন আমার কাছে, আমার সেবায়—আমার পরিচর্যায়?

হেসে বললেন,—আতিথেয়তা। অতিথিকে স্ত্রী দান ক'রেও আপ্যায়িত করার রীতি আছে ওদের মধ্যে, কিন্তু এক্ষেত্রে রীতির থেকেও মনের প্রসারতার কথাটাই বড়।

চুপ ক'রে রইলাম কিছুক্ষণ। বুকেব ভিতরটা যেন রুদ্ধ আবেগে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, —আরও একটা কথা।

—বলুন।

বললাম,—মৃত্যুর সময় আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে আমাদের তিনজনের কপালে টিকা দিয়েছিল কেন 'পাওয়া' বলতে পারেন?

—হ্যাঁ, তা-ও পারি। 'সালোন'দের রীতিনীতির কথা আমারও কিছু জানা আছে। খৃষ্টান মিশনারীরা যাবার চেষ্টা করছে ওদের মধ্যে, আমরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হ'য়েই বা সে চেষ্টা করব না কেন?

—শুনেছি। কিন্তু সত্যিসত্যিই কি আপনারা—যাবেন ওদের মধ্যে?

চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপরে বললেন,—না। যাওয়া নিরর্থক। নতুন কী শেখাবো? বুদ্ধের কোন্ বাণী ওদের অজানা?

প্রকৃতিই ওদের দীক্ষা দিয়েছে, সমুদ্র-দেবতাই ওদের 'ফড়া', ওদের বোধিসত্ত্ব, ওদের গুরু, ওদের পথ-নির্দেশক। কিন্তু হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আপনার কপালে ঐ যে রক্তের টিকা পরিয়ে গেল যাবার সময়, ওর অর্থ কী জানেন? আপনার হাতে ওর স্ত্রী আর পুত্রকে সে সঁপে দিয়ে গেল।

—তার মানে!

শান্ত কণ্ঠেই বললেন,—সালোনদের অলিখিত আইন অনুসারে আপনিই হয়েছিলেন ঐ আনা মেয়েটির স্বামী, আর ঐ শিশুটির পিতা।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—আমার স্ত্রী! আর আমি সর্বক্ষণ…

—বলুন?

কেমন যেন আবেগে রুদ্ধ হ'য়ে যেতে চায় আমার কণ্ঠ; কোনক্রমে বললাম,—কেন আমি ওকে ভুল বুঝেছিলাম! এক এক সময় মনে হ'ত, মেয়েটি কী পাষাণ! 'পাওয়া'র কথা ওর মনে একেবারে পড়তই না!

একটু হেসে বললেন,—মেয়েদের কথা বোঝা সহজ নয় যে! তা সে' নিরাবরণ আদিবাসীই হোক, আর সুসভ্য নাগরিকই হোক। হয়তো আপনাকে আপন ক'রে নেওয়ার মধ্যেই তার সব কিছুর সার্থকতা ছিল! 'পাওয়া'র স্মৃতির সার্থকতাও!

মাথাটার মধ্যে ততক্ষণে যেন রিম্‌ঝিম্‌ কী একটা অব্যক্ত সুরের অনুরণন শুরু হয়েছে! কতগুলি এলোমেলো চিন্তার স্রোতের আঘাতে যেন বিপর্যস্ত হ'য়ে গেছি। ভগ্নকণ্ঠে বলে উঠলাম,—কিন্তু আনা আমাকে ছেড়ে হঠাৎ চলে গেল কেন, বলতে পারেন?

উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসীজী, বললেন,—শুধু এই একটা প্রশ্নের উত্তরই আমি দেবো না, দিতে পারবও না।

কঠিন কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

সন্ন্যাসীজী বললেন,—লোকে বলে আদিম মানুষের প্রবৃত্তিকে বহন ক'রে চলেছে আদিবাসী ঐ 'সালোন' ধরনের মানুষেরা। ভাবছি, কতো কম জানে তারা! 'মা হিংসী পানভূতানি', কাউকে হিংসা ক'রো না,—একথা নতুন ক'রে শেখাতে হ'ল না ঐ জলকন্যাকে। আচ্ছা, তোমরা বসো, আমি ফড়ার ঘরে যাই। মনটা অস্থির হ'য়ে আছে। প্রার্থনা করি গিয়ে শান্তির জন্য।

চলে গেলেন। আমি আর রঞ্জনা দেবী শুধু বসে রইলাম সেই শূন্য ঘরটিতে। কতো মুহূর্ত পার হ'য়ে গেল কে জানে, এক সময় যেন চমক ভেঙেই উঠে দাঁড়ালেন রঞ্জনা দেবী, বললেন,—আমি জানি আপনার প্রশ্নের উত্তর।

—কী?

—আসুন আমার সঙ্গে।

অন্ধকারে পাশাপাশি হেঁটে আমরা এলাম কালাডোন নদীর ঘাটের কাছের সেই আমাদের ঘরে।

সব ঠিক তেমনি পড়ে আছে, একটি দ্রব্যও এদিক-ওদিক হয়নি। সেই শাড়ি, সেই সায়া, সেই ব্লাউজ,—দু'হাতে তুলে বুকের কাছে চেপে ধরে বললেন,—এগুলি কার জানেন? আমার। ও এগুলিই কেন বেছে বেছে পরতে চাইত জানেন? ও 'আমি' হতে চেয়েছিল। বুঝেছেন ওর মনের গভীরতা? আমরা কেউ যা বুঝি নি, ওর অপাপ-বিদ্ধ মন তা-ই বুঝেছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কী লাভ ওর এই 'আমি' হ'য়ে? তাই কায়াকে রেখে ছায়া গেল ছায়াতেই মিলিয়ে!

সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল মুহূর্তে। সারাটি দিন কেটে যাবার পর, এই এতক্ষণ পরে হু-হু-করা কান্নায় ভেঙে পড়লেন রঞ্জনা।

কার হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুক্-ধুক্‌ধুক্ শব্দের মতো যেন ঘড়ির কাঁটাটা টিক্‌টিক্ করতে লাগল। রাত নিশ্চয়ই গভীর। বাইরে ট্রামের

সোঁ-সোঁ শব্দও আর শোনা যায় না। একটা রিক্সার টুং-টাং শুধু দূর থেকে কানে এসে বাজছে।

গভীর শ্রান্তিতে কর্নেল মল্লিক ততক্ষণে এলিয়ে দিয়েছে নিজেকে বিছানার ওপরে। আমি বসে থাকব, কি চলে যাব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, এমন সময় দরজার কাছে কার সাড়া পেয়ে যেন চোখ খুললেন মল্লিক, বললেন,—এসো রঞ্জনা।

চোখ তুলে তাকালাম মল্লিকের অসূর্যম্পশ্যা স্ত্রীর দিকে। কিন্তু, কী-ই বা বলতে পারি তাঁকে? উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললাম,—কিছু ভাববেন না। ভালোই আছেন আপনার স্বামী। আমি কাল আবার আসব দেখতে।

অন্ধকার নির্জন পিচের কালো রাস্তার ওপরে পা ফেলে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল, যেন নতুন এক রাজ্যে তখনও বিচরণ করছি। আরাকানের সেই পুরনো রাজধানী 'মেহং-এর অজস্র বুদ্ধমূর্তি যেন আমার চারপাশে, অজস্র হাত যেন ওঠানো অভয় মুদ্রায়, যেন বলছেন,—আমি এখনও বেঁচে আছি তোমাদের মধ্যে, তোমাদের অহিংসার মধ্যে, ক্ষমার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, সাম্যের মধ্যে, স্নেহের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে!